প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত



ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৫
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সুব্রত চৌধুরী

ISBN81-7066-118-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১২·০০

সূচী

এই লেখকের অন্যান্য বই

যাঁর নাম ঘনাদা
ঘনাদার ফুঁ
তেল দেবেন ঘনাদা
ছড়া যায় ছড়িয়ে
ঘনাদা তস্য তস্য অম্‌নিবাস
মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা

ঘনাদার চিংড়ি-বৃত্তান্ত

(১)

"হয়তো !" হ্যাঁ, বাক্যটা ঘনাদার মুখ থেকেই উচ্চারিত হল। কিন্তু কেমন যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ওই শব্দটুকু মুখ দিয়ে বার করেই গুম হয়ে গেলেন ঘনাদা। "কেন হয়তো ?"

কী হয়তো ? কেন হয়তো ? এমন অনেক প্রশ্নই তখন মনের মধ্যে তো বটেই, জিহ্বাগ্রেও যে এসেছিল, তা অস্বীকার করব না। কিন্তু ঘনাদার মুখ-চোখে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ছায়া দেখে তা উচ্চারণ করতে আর সাহস করিনি।

ঘনাদার মুখ দেখে তাঁর মনের ভাব বুঝব, এত বড় ধুরন্ধর আমরা কেউ নই। তবু মনে হচ্ছিল একটা কী বিষয়ে তিনি যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মনস্থির করতে পারছিলেন না।

তাঁর মনে যে অস্থিরতাটা, সেটা এক হিসেবে 'না' আর 'হ্যাঁ'-এর দ্বন্দ্বও হতে পারে।

'হয়তো' বলে তিনি যে একটা সম্ভাবনার আভাস দিচ্ছিলেন, সেটা আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি প্রকাশ করবেন কি না, এই নিয়েই তাঁর মনে বেশ প্রবল দ্বিধা ছিল বলে মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত এ-দ্বিধার মীমাংসায় 'না'-এর উপরে 'হ্যাঁ'-ই যে জয়ী

হল, এ আমাদের ভাগ্য।

"হ্যাঁ।" মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ঘনাদা তাঁর 'হয়তো'কে বিস্তারিত করে বললেন, "হয়তো সে ঠিক খবরই পাঠিয়েছিল। কিন্তু..."

'কিন্তু'র পর যে দীর্ঘ নীরবতা, সেটা প্রায় যন্ত্রণায় পৌঁছে দিয়ে ঘনাদা তাঁর বক্তব্যটা পেশ করলেন। বললেন, "কিন্তু 'কানুড়ি' থেকে ফাং-এ অনুবাদ করাতেই হয়তো ভুল হয়েছে। আর, তারপর 'হাউসা'য় তার 'কান'গুলো 'ধান' হয়ে-সব এমন বরবাদ করে দিয়েছে যে, আমি সোজার বদলে উলটো খবরই পেয়েছি।"

মুখটা তাঁর পক্ষে যতখানি সম্ভব করুণ করে ঘনাদা চুপ করলেন।

কিন্তু আমরা যে তখন একেবারে অকূল পাথারে! ঘনাদার প্রথম 'হয়তো'র পরেই যেটুকু ফাঁপরে পড়েছিলাম, 'ফাং' 'হাউসা' 'কানুড়ি'র জালে জড়িয়ে তা যে একেবারে গোলক-ধাঁধার ফাঁদ হয়ে উঠল।

কী বলছেন ঘনাদা? মানে বলতে চাইছেন কী?

সোজাসুজি সে-কথা যে জিজ্ঞেস করব, তার উপায় নেই। কারণ অমন বেয়াদপিতে উত্তর যা মিলবে, তাতে নখ কাটাতে গিয়ে আঙুল কাটিয়ে ফেলার ঝক্কি নেওয়া হবে।

তার চেয়ে ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করাই ভাল। নিজের পাকানো জট ঘনাদা সময়মতো নিজেই কি আর খুলবেন না?

সেই ধৈর্য ধরেই থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অবুঝ গৌরটার জন্যে তা থাকা আর হল কই?

"কী হাং-ফাং করছেন?" ঘনাদাকে সে একটু গরম গলাতেই জিজ্ঞেস করে বসল, "হিং টিং ছটের মতো মন্তর-টন্তর নাকি?"

"না, মন্তর-টন্তর নয়?" ঘনাদার গলার ঝাঁঝটুকু আর লুকনো নেই এবার, "কিন্তু ওগুলো কী, বোঝাতে গেলে একটু ভূগোলের পরীক্ষা আগে নিতে হবে।"

"ভূগোলের পরীক্ষা?" সভয়ে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, "কী

পরীক্ষা ঘনাদা ?”

“না, এমন কিছু পরীক্ষা নয়,” ঘনাদা আশ্বাস দিয়ে বললেন, “শুধু ক'টা অতি সোজা প্রশ্নের জবাব। যেমন, কোন্ দেশে একসঙ্গে আবলুস, সেগুন, মেহগনির সঙ্গে প্রচুর তাল-তমাল যেমন পাওয়া যায়, তেমনি প্রচুর পাওয়া যায় অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ; টিন, বক্সাইড থেকে হীরে আর সোনা ?”

একটু থেমে আমাদের মুখের ভাবটা লক্ষ করে ঘনাদা এবার বললেন, “এসব যদি একটু কঠিন প্রশ্ন মনে হয়, তা হলে একটা মাত্র অতি সোজা প্রশ্ন করছি। যার উত্তর জানলে দেশটার নাম বলতে আর কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। প্রশ্নটা হল এই, কোন্ দেশে এই শতাব্দীর গোড়ায় ১৯০৯ আর ১৯২২-এ দু'বার এক আগ্নেয়গিরি থেকে দারুণ অগ্ন্যুদ্গার হয়েছে ?”

কী জবাব দেব এ-সব প্রশ্নের ?

ভ্যাবাচাকা ভাবটা কোনওরকমে লুকোবার চেষ্টা করে মাথা চুলকোবার অভিনয়ই করছিলাম, তারই মধ্যে “শুনুন ঘনাদা”, বলে গৌর হঠাৎ মুখ খোলায় সত্যিই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

ঘনাদা এমনিতেই খুব ভাল মেজাজে আছেন বলে মনে হচ্ছে না। তার ওপর বেয়াড়া কিছু বলে গৌর যদি তাঁকে গরম করে দেয়, তা হলে অন্তত আজকের দিনের মতো আমাদের বাহাত্তর নম্বরের মজলিস একেবারে মাটি।

কিন্তু ভয় যা করছিলাম, উলটোটাই তার হল।

জাতে পাগল হলেও গৌর যে তালে ঠিক, তা বোঝা গেল তার পরের কথায় !

বেয়াড়া কিছুর বদলে, গরম হওয়ার বদলে ঘনাদা তাতে গলে একেবারে জল।

কী এমন বললে গৌর, যাতে খোঁচানো সাপও ফণা তুলতে ভুলে যায় ? কী সে মন্তর ?

না, হাত কচলানো খোশামুদি গোছের কিছু নয়। বরং তাতে 'ফোঁস' করার ঝাঁঝই একটু আছে বলা যায়। কিন্তু কাজ হল ওই ফোঁসানির সুরেই।

মিষ্টি সুরে-টুরে নয়, গৌর ঘনাদার ওপর অভিমানেই নালিশ জানিয়ে বললে, "অত ভূগোলের পরীক্ষা যদি দিতে হয়, তা হলে পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির পিছনেই তো ছুটলে পারি! তার বদলে এই বাহাত্তর নম্বরে আপনার মুখ চেয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকব কেন? মোড়ের দোকানে এক চেঙারি হিঙের কচুরির অর্ডার দিয়ে এসেছি। বনোয়ারি তা নিয়ে নীচের গেটের মুখেই বোধহয় পৌঁছে গেছে। রামভুজের সেগুলো প্লেটে-প্লেটে সাজিয়ে পাঠাতে যা দেরি। কিন্তু এখন আর কী হবে তাতে, সব ঘাস লাগবে মুখে, হ্যাঁ, ঘাস।"

গৌর চুপ করল এমন একটা হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে, আমাদেরই দু'চোখের পাতাগুলো কেমন যেন একটু ভিজে-ভিজে হয়েছে মনে হল।

ঘনাদারও তা-ই হল কি না জানি না। কিন্তু তাঁর গলায় এবার যে সুরটা শোনা গেল, সেটা স্পষ্টই সান্ত্বনার।

"আহা! হিঙের কচুরি ঘাস হতে যাবে কেন?" তিনি আশ্বাস দিলেন, "এই আমাদের মোড়ের জহর হালুইকরের হিঙের কচুরি তো? ও আজ বিকেলে আনিয়ে কাল সকালে মুখে দিলেও মুচমুচে থাকে। তবে…"

ঘনাদার হিঙের কচুরির কৌলীন্য-বিচার আর হল না। বিরাট ট্রে'র ওপর কচুরি-সাজানো প্লেট নিয়ে বনোয়ারি তখন আড্ডা-ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকল। সে ঢোকার আগেই তার ট্রে'র ওপরকার প্লেটে সাজানো কচুরির গন্ধেই অবশ্য আড্ডা-ঘর মাত হয়ে গেছে।

ঘনাদার চিংড়ি-বৃত্তান্ত

(২)

বনোয়ারি তাঁর হাতেই প্রথম যে প্লেটটা তুলে দিল, তার ডবল সাইজের কচুরির তাক যে প্লেটের ওপর প্যাগোডার মতো, তা বোধহয় আর বলতে হবে না।

সেদিকে চেয়ে অন্তরের খুশিটা অকপট উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করেই ঘনাদা বললেন, "হিঙের কচুরি কী হে, এ তো রাধা-চুরি ! মানে রাধাবল্লভী আর কচুরির দ্বন্দ্ব-সমাস। তা বড় বেশি দিলে যে ! এত কি আর এ-বয়সে শেষ করতে পারব ?"

"খুব পারবেন, খুব পারবেন," সবাই আমরা জোর গলায় আশ্বাস দিলাম, "বয়স আপনার আর কি, চল্লিশই তো পার হয়নি।"

"চল্লিশ··· ! বলো কী হে !" ঘনাদা বিষম খাওয়াটা কোনওরকমে সামলে বললেন, "আমার চল্লিশ···"

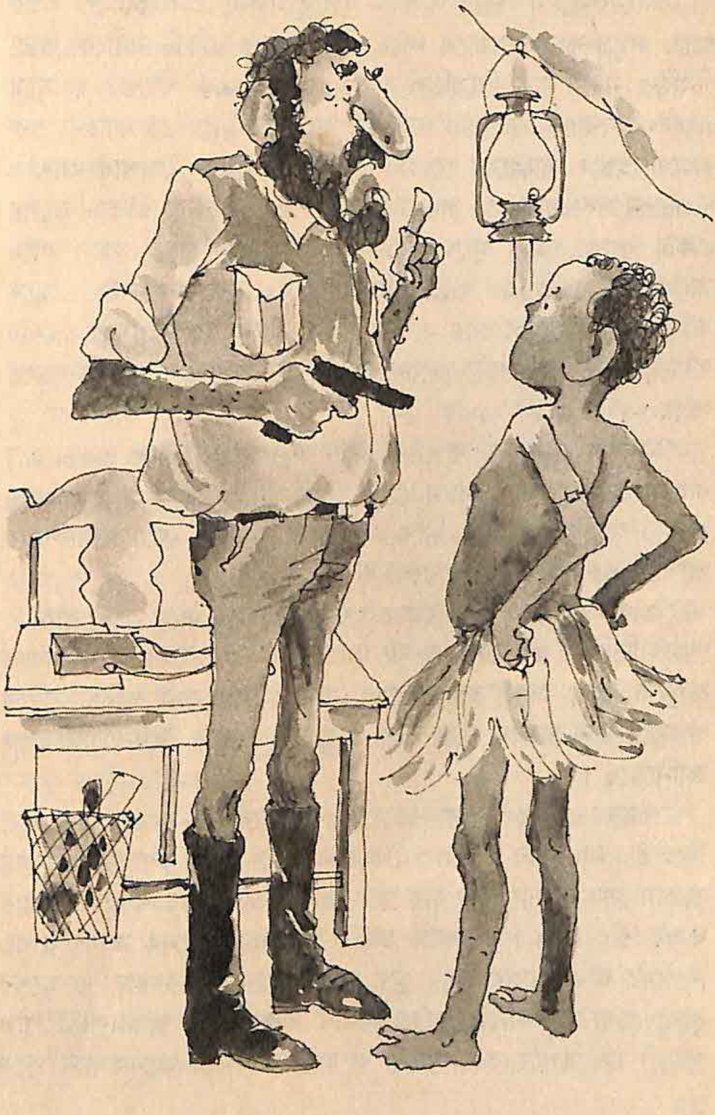
"মানে ?" চটপট বাধা দিয়ে বললাম, "চল্লিশে পৌঁছে ঠেকে গেছে আর কি ! পার হতে তো পারছে না ! তাই বলছি···"

তাই আর কিছু বলতে হল না। যে-কারণেই হোক, ঘনাদা একটু বেশিরকম খুশি হয়ে তাঁর প্লেটের রাধা-চুরি প্যাগোডার ওপর চুড়ো হিসেবে আরও দুটো শেষ করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে শিশিরের

এগিয়ে ও জ্বালিয়ে দেওয়া সিগারেটটায় ক'টা সুখটান দিয়ে যেন ধাতস্থ হয়ে, প্রায় মেজাজের অসীম প্রসন্নতার পরিচয় দিয়ে নিজে থেকেই গোড়ায় ধরা প্রসঙ্গটা স্মরণ করে বললেন, "হ্যাঁ, ভূগোল শেখায় তোমাদের আপত্তি জানাচ্ছিলে, না ? কিন্তু ভূগোলের প্রশ্ন কেন তুলেছিলাম জানো ? তুলেছিলাম, যা বলতে যাচ্ছি, ভূগোল কিছুটা না-জানা থাকলে তার রহস্যটাই ঠিক বোঝানো যাবে না। ভূগোলের ক'টা সোজা প্রশ্ন মাত্র তোমাদের করেছি। প্রশ্ন আর-দুটো বেশি করলে হয়তো উত্তরটার আভাস তোমরাও পেতে। এই যেমন যে ক'টা প্রশ্ন করেছি তার ওপর যদি জানতে চাইতাম, কোন্ দেশে, কোথায় গোরিলাও যেমন, সিংহও তেমনি পাওয়া যায়, তা হলে তোমরা চটপট উত্তর দিতে—আফ্রিকা। কিন্তু আফ্রিকা তো একটা বিরাট মহাদেশ। শুধু আফ্রিকা বললেই তো হবে না, আফ্রিকার কোথায়, বোঝানো যাবে না। সুতরাং শুধু আফ্রিকা বললেই হবে না, আফ্রিকার কোথায়, সেটা সঠিক জানা চাই।

"সঠিক জায়গাটা এখনও হয়তো ধরতে পারোনি বলেই বলে দিচ্ছি জায়গাটা। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে এমন একটা অঞ্চল, যার বর্ণনা দেওয়া খুবই শক্ত। গাছপালা আর ধাতু-সম্পদের কথা আগে আমার প্রশ্নে যা বলেছি, তাতেই বোঝা যাবে যে, জায়গাটার বৈচিত্র্যের শেষ নেই। দেড়শো থেকে দু'শো ফুট উঁচু গাছের ঘন জঙ্গল যেমন আছে, তেমনি আছে শুধু কাঁটাঝোপের বিস্তীর্ণ আধা-মরু অঞ্চল। একদিকে গোরিলা শিম্পাঞ্জিদের যেমন দেখা মেলে, তেমনি দেখা যায় উটপাখির পাল।

"আর বেশি বর্ণনা দিতে গেলে রাত কেটে যাবে। তাই জায়গাটার নামটা বলেই ফেলি। নাম হল 'ক্যামেরুনস'। বর্ণনা আগে যেটুকু দিয়েছি, তার ওপরে বলতে পারি যে, যেমন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে তেমনি ইতিহাসের চমক দেওয়া কিছু ঘটনার বিশেষত্বে আফ্রিকার এই উত্তর-পশ্চিম কোণের ভূখণ্ডটির একটা নিজস্ব মূল্য আছে।



"ক্যামেরুনসের উত্তর-পশ্চিমে পোর্তুগিজরা প্রায় চারশো বছর আগে সমুদ্র-কূলে যেখানে নামে, সেখানকার একটি নদীকে তারা 'চিংড়ির নদী' নাম দিয়েছিল। ১৯১৯-এর এক শীতের মরসুমে একদিন সেখানে এক বুনো চেহারার সাহেবকে নিয়ে এই কাহিনী শুরু করতে হয়। সাহেবের চেহারাটা বুনো হলেও পোশাক-আশাক চালচলন সব একেবারে বাদশাহি মেজাজের। মাথায় ঝাঁকড়া চুলের একটা বোঝা, আর মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল বাদে মানুষটার সবকিছুই ভদ্র, ফিটফাট আর মানানসই। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল আর মাথায় জট-পাকানো চুলের ঝোপ। সেটা তাঁর মুখের কোনও কাটা ঘায়ের দাগ-টাগ ঢাকা দেওয়ার ফিকির হতে পারে।

"মানুষটা চিংড়ি নদীর ধারে একটা বড় গঞ্জের পাশে একটা মস্ত বাহারি তাঁবু পেতে সেখানে ডেরা বেঁধেছেন। এর মধ্যে ওখানকার কাফরি গাঁয়ের সর্দারকে নিজের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে খানাপিনায় আপ্যায়িতও করেছেন বারকয়েক।

"তাঁর মতলবও কিছু লুকোবার নেই। এখানে এসে ডেরা বাঁধবার পরেই তিনি এ-তল্লাটের যে দুই যমজ ঘটোৎকচের মতো দৈত্যাকার বাণ্টুকে তাঁর কাজে লাগিয়েছেন, তারাই সাহেবের পরিচয় দিয়ে শতমুখে তাঁর প্রশংসা করে তাঁর এ-মুলুকে আসার উদ্দেশ্য সকলকে জানিয়েছে।

"তাদের কাছে জানা গিয়েছে, সাহেবের নিজের দেশ হল বিলেত। নাম তাঁর ডাঃ লক। অজানা দেশে পাড়ি দিয়ে সেখানকার অজানা সব রহস্য খুঁজে বার করে তার যতটা সম্ভব খবরাখবর বার করাই তাঁর কাজ। এ-কাজে ডাঃ লক দুনিয়ার অনেক জায়গায় বহু বিপদের ঝক্কি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর মাথা ও মুখের বুনো চেহারার আসল কারণ এমনি এক দারুণ আচমকা বিপদে পড়া। সে-বিপদে তাঁর মুখের ও মাথার চামড়া অনেকখানি পুড়ে

সাদা হয়ে যায়। কোনওরকমে শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচলেও বীভৎস চেহারার লজ্জায় তিনি আর পোড়া মুখ কাউকে না দেখাবার জন্যে মুখ ও মাথায় অমন জঙ্গল বানিয়ে রেখেছেন।

"এখন এই চিংড়ি নদীর মোহানায় তাঁর আস্তানা পাতবার কারণ কিন্তু তাঁর সেই অজানা দেশের রহস্য জানবার নেশা। এই ক্যামেরুনসের ভেতরে এক জায়গায় যে এক দারুণ আগ্নেয়গিরি আছে, তা সবাই জানে! মাঝে-মাঝে বহু বছর অন্তর সেই আগ্নেয়গিরি খেপে উঠে আগুন উগরে তুলে ছড়ালেও তার সঠিক হদিস সভ্য জগতের কেউ এখনও জানে না। ডাঃ লক সেই রহস্য সন্ধানের অভিযানে যাবার জন্যে পথের দিশারি হবার মতো একজন ও অঞ্চলের সেথো চান। তাঁর দুই যমজ ঘটোৎকচের মতো পাহারাদারকে তিনি সেই খোঁজেই লাগিয়ে রেখেছেন। এই যমজ দানবদের পাহারাদারের কাজে নেওয়ার একটা বিশেষ কারণ আছে। ডাঃ লকের কে একজন নাকি পরম শত্রু তাঁর সুনামের হিংসায় বহুকাল থেকে তাঁর পেছনে লুকিয়ে লেগে থেকে হয় তাঁর আবিষ্কারের গৌরব চুরি করে নিজের বলে প্রচার করতে, নয় সেটা সম্ভব না হলে তাঁর বড় রকমের কোনও ক্ষতি করবার চেষ্টা করে আসছে। তার বিরুদ্ধে পাহারা দেবার জন্যেই ডাঃ লক এবার একজন নয়, গোধা আর লোধা নামে দুই যমজ ঘটোৎকচ ভাইকে নিজের কাজে লাগিয়েছেন।

"গোধা আর লোধা শুধু শরীরের ক্ষমতাতেই দুর্দান্ত দানব নয়, তারা কাজের লোকও বটে।

"লক-সাহেব চিংড়ি নদীর ধারে দিন-পাঁচেক তাঁবু ফেলবার পরেই তারা একজনকে জোগাড় করে আনে গঞ্জের এক বাজার থেকে।

তাকে দেখে ডাঃ লক হেসেই খুন।

"'আরে এ কাকে এনেছিস ?' হাসতে হাসতে ডাঃ লক জিজ্ঞেস করেন গোধা-লোধাদের, 'এ চিমসে শুঁটকোটা তো তোদের চিংড়ি

নদীর সত্যিকারের একটা কুচোচিংড়ি।'

"ডাঃ লকের কথায় লজ্জা পেলেও লোধা-গোধা নিজেদের একটু কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে বলে, 'আজ্ঞে, আপনি মিছে ঠাট্টা করছেন কেন ? ও চিমসে চিংড়ি হলে আমাদের লোকসানটা কী ? ওকে তো আর কুস্তি লড়তে হবে না। শুধু আমাদের পথ দেখিয়ে যেখানে যেতে চান সেখানে নিয়ে যাবে।'

"লোধা-গোধার যুক্তিটা যে ঠিক, ডাঃ লককে এবার তা স্বীকার করতে হয়। তিনি তাই হাসি থামিয়ে একটু ভাবনার সঙ্গেই জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তু ওকে যা ঠাট্টা-অপমান করলাম, এর জন্যে ও আর আমার কাজ করতে চাইবে কি ?'

"'খুব চাইবে, খুব চাইবে', আশ্বাস দিয়ে বলে লোধা-গোধা 'দেখতে পাচ্ছেন না, কেমন অবাক হয়ে হাঁ করে তাঁবুর সব জিনিসপত্র দেখছে। ও আমাদের কথা কিছু বুঝেছে কি যে, ঠাট্টা-অপমানে রাগ করবে ?'

"'কিছু বোঝেনি মানে ?' ডাঃ লক বেশ ভয় পেয়েই জানতে চান, 'ও কি বদ্ধ কালা-টালা নাকি ? তা হলে...'

"'না, না, কালা হবে কেন ?' লোধা-গোধা এবার বুঝিয়ে দেয় ডাঃ লককে, 'আমরা তো বান্টুতে কথা বলেছি, ও তার কী বুঝবে ?'

"'বুঝবে না কী রকম ?' ডাঃ লককে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতে হয়, 'ও কি বাণ্টু জানে না ?'

"'এক বর্ণও না,' লোধা-গোধা জানায়, 'বাণ্টু কেন, ওর নিজের ভাষা কানুড়ি ছাড়া হাউসা, ফুলানি, ফাং কিছুই জানে না।'

"'ঠিক, ঠিক', ডাঃ লক খুশি-মুখে এবার বলেন, 'নিজের ভাষা ছাড়া আর কিছু জানে না, এমন লোকই আমাদের সবচেয়ে দরকার। আজই ওকে কাজে নাও।'

"তাই নেওয়া হল সেই দিনই। কাজে নেবার সময় নামটা নিয়ে শুধু একটু গোল বেধেছিল।

"খাতায় লেখার জন্যে তো বটেই, তাকে ডাকবার জন্যেও একটা নাম তো দরকার। কিন্তু নিজের কোনও নামই সে বলতে পারে না। সে যেখানে থাকে সেখানে গোনাগুনতি ক'টা তার মতো জংলীর মধ্যে ডাকাডাকির কোনও দরকারই নাকি হয় না। হলেও তারা 'এই' 'ওই' বলে ডেকেই তাদের কাজ সারে।

"কিন্তু সেখানকার নিয়ম এখানে চলে না। নাম তো একটা দরকার। শেষকালে জংলীটা নিজেই বললে, এই কার্মার্দে মানে চিংড়ি নদীর মোহানাতেই যখন সে প্রথম কাজ পেয়েছে তখন তার নাম চিংড়িই রাখা হোক।

"ডাঃ লক খুশি হয়ে বলেছেন, 'ঠিক ঠিক। ওর যা চিমসে কুচোচিংড়ির মতো চেহারা, তাতে ওই নামই ওর ভাল।' মানুষটা জংলী হলেও তার মাথাটা একেবারে নিরেট নয় দেখেও তিনি খুশি হয়েছেন।

"চিংড়িটাকে প্রথমে তার কাজ বুঝিয়ে দেওয়া একটু শক্ত হয়েছে। বুদ্ধিশুদ্ধি নিরেট না হলেও লোকটা একেবারে জংলী। সাহেবসুবো তো দূরের কথা, সাধারণ একটু ভাল অবস্থার গৃহস্থ বাণ্টু কি হাউসাদের ঘরদোরের খবরও জানে না।

"ডাঃ লকের তাঁবুতে বেশি কিছু দামী ও বিদেশী আসবাব না থাকলেও, তাঁর কাজের জন্যে যা দরকার সেরকম কিছু যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ছিল। তাঁর তাঁবু ঝাড়পোঁছ করবার সময় ডাঃ লক সেগুলো সম্বন্ধে তাকে হুঁশিয়ার হওয়ার নির্দেশ দিতে বলেছিলেন তাঁর খাস-পাহারাদার লোধা আর গোধাকে। তাই দিতে গিয়ে প্রায় কেলেঙ্কারি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

"জরিপ-টরিপের জন্য দরকারি যন্ত্রপাতি ছাড়া ডাঃ লক তাঁর কাজের সুবিধের জন্য একটা টেপরেকর্ডার তাঁর সঙ্গে রেখেছিলেন। তিনি যে-ধরনের অভিযানে এসেছেন, তার প্রাত্যহিক বিবরণ রাখা একান্ত দরকার। একালে সে-বিবরণ হাতে লেখার তো কথাই আসে

না। টাইপ করার জন্যে সঙ্গে টাইপরাইটার রাখাও একটা বাড়তি বেয়াড়া বোঝা বওয়া। ডাঃ লক তাই একটা ছোট টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়েছিলেন, যাতে তাঁর অভিযানের প্রতিদিনের বিবরণ তিনি মুখে বলে টেপ-এ ধরে রাখতেন।

"সেই যন্ত্রটা নিয়েই গণ্ডগোল বেধেছিল প্রথমে। পরে সাফসুফ করার সময় ও যন্ত্রে হাত না দিতে বলার জন্যে রেকর্ডারটা একটু চালিয়ে দেখাতে যেতেই হাউমাউ করে চিৎকার করে পড়ি কি মরি অবস্থায় চিংড়ি তো তাঁবুর বাইরে দে ছুট। সে তখন এই ভুতুড়ে তাঁবুর কাজ ছেড়ে দিতে চায়। লোধা-গোধাকে তারপর অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে তাঁবুতে ফেরাতে হয়েছে।

"এরপর আর বিশেষ গোলমাল-টোলমাল হয়নি। যে-কাজের জন্যে তাকে নেওয়া, সে-কাজে চিংড়ি বাহাদুরিই দেখিয়েছে দিন কয়েকের মধ্যে। ক্যামেরুনসের এই অঞ্চল প্রায় অজানা জঙ্গল-পাহাড়, আবার আধা-মরুর দেশ। বুনো মোষ, হাতি, গণ্ডার, সিংহ থেকে হিংস্র জংলী আদিবাসীদের এড়িয়ে সেখানে প্রতি পদে প্রাণ হাতে নিয়ে টহল দিতে হয়। এ-কাজে চিংড়ি কিন্তু দারুণ বাহাদুর। ডাঃ লক ক্যামেরুনসের ভিতরের দিকে চাড হ্রদের কাছে এক আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি অঞ্চলেই যেতে চান। প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু সেই আগ্নেয়গিরি নয়, তার কাছাকাছি 'নিশ' নামে এক হ্রদই তাঁর লক্ষ্য।

"পদে-পদে যেখানে বিপদ, সেই সম্পূর্ণ অজানা, অতি দুর্গম দেশে চিংড়ি কিন্তু কোন অদ্ভুত ক্ষমতায় সবচেয়ে নিরাপদে আর তাড়াতাড়ি লক্ষ্যের দিকে পৌঁছচ্ছে বোঝা গেল।

"এদিক দিয়ে পুরোপুরি খুশি হবার কারণ থাকলেও, ডাঃ লক তখন কিন্তু দারুণ ভয় আর দুর্ভাবনায় পড়েছেন। তাঁর যে দুশমনের ভয়ে লোধা-গোধার মতো দুই যমজ ঘটোৎকচকে তিনি পাহারায় নিয়েছেন, তার হাত থেকে তিনি যে রেহাই পাননি, তা তিনি এই

অভিযানে চিংড়ি নদীর মোহানা থেকে রওনা হবার ক'দিন পরেই টের পেলেন।

"সে দুশমন যে তাঁর সঙ্গেই আছে তার প্রথম প্রমাণ যা পাওয়া গেল, তা খানিকটা যেন ঠাট্টার মতো ব্যাপার। অভিযানের বিবরণ টেপরেকর্ডারে তুলে রাখলেও পথের হদিস ধরে রাখবার জন্য ডাঃ লক খুব সংক্ষেপে একটা মানচিত্রের খসড়া লিখে আর এঁকে রাখতেন। সেই খসড়া ম্যাপের উপর একদিন হঠাৎ কিছু হিজিবিজি কাটা দেখা গেল।

"সেই হিজিবিজি কাটাকুটিতে ভাবনার খুব বেশি কিছু ছিল না। চিংড়িই হয়তো তাঁবুর ঝাড়পোঁছ করবার সময় অসাবধানে বা জংলি খেয়ালে তাতে অমন দাগ কেটে থাকতে পারে, কিন্তু সেই হিজিবিজির পাশে স্পষ্ট অক্ষরে যা লেখা, সেটাই তো অবিশ্বাস্য একটা রহস্য।

"হিজিবিজির আশেপাশে গোটা-গোটা হরফে স্প্যানিশে লেখা 'ট কোয়ে তাল আমিগো ?'

"ডাঃ লক স্প্যানিশ না জানলেও ও ক'টা কথার মানে জানেন। ও কথাগুলোর মানে হল, 'কেমন আছ বন্ধু ?'

"এই অজানা বিদেশে এক গোপন অভিযানে এতদূর আসবার পরে তাঁর দুই যমজ দানব আর এক জংলী নফরের পাহারা দেওয়া তাঁবুতে ঢুকে এ-কাজ কার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হতে পারে ?

"সম্পূর্ণ ভৌতিক ছাড়া ব্যাপারটার তো আর কোনও ব্যাখ্যা হয় না।

"অত্যন্ত অস্থির হলেও ব্যাপারটা নিয়ে হইচই না করে ডাঃ লক রহস্যটা বুঝবার জন্যে কিছুদিন নিঃশব্দে সজাগ থাকবেন বলে ঠিক করলেন।

"কিন্তু তার ফল যা হল, তাতেই তাঁর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম।"

ঘনাদার চিংড়ি-বৃত্তান্ত

(৩)

গল্প বলতে বলতে চুপ করে গেলেন ঘনাদা। কী হল ? কেন আর তিনি মুখ খুলছেন না ? কেন যে খুলছেন না, শেষ পর্যন্ত শিশিরই সেটা বুঝতে পেরে এগিয়ে দিল তার সিগারেটের টিন। ঘনাদা তার থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফের শুরু করলেন তাঁর গল্প।

"যেমন তাঁর নিয়ম, তেমনি সেদিন সকালের খাওয়া-দাওয়ার পর ডাঃ লক তাঁর টেপরেকর্ডারটা নিয়ে তাঁর অভিযানের আগের দিনের বিবরণ রেকর্ড করবার ব্যবস্থা করছিলেন।

"কিন্তু যন্ত্রটা দেখেই তো তাঁর চক্ষুঃস্থির।

"তাঁর আগে কেউ যে সেটা ব্যবহার করেছে, তার স্পষ্ট চিহ্ন সেখানে রয়েছে।

"সেটা নিয়ে যে নাড়াচাড়া করা হয়েছে তা লুকোবার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি। যেখানে যন্ত্রটা থাকে, তার বদলে টেবিলের অন্য একধারে অগোছালো কাগজপত্রের মধ্যে এমনভাবে সেটা ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে ওখানে যে অন্য কারও হাত পড়েছে, তা বুঝতে কোনও কষ্ট না হয়।

“এরপর যন্ত্রটা চালাতে যা শোনা গেল, তাতে ভাবনায়, আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা হবার জোগাড়। স্পষ্ট জার্মান ভাষায় সেখান থেকে তখন শোনা যাচ্ছে, ‘আমি তোমার সঙ্গে আছি ডাঃ লক। আর লক, তোমার আসল নাম যে ব্রুল, তা আমার জানা!’

“টেপরেকর্ডারের কথা ওইটুকুতেই শেষ হয়েছে। কিন্তু যেটুকু ওখানে আছে তাই শুনেই ডাঃ লক তখন চোখে অন্ধকার দেখছেন বলা চলে। প্রথমত, নিজের ঠিকমতো হুঁশ আছে কি না সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল। সত্যিই, নেহাত স্বপ্নে ছাড়া এরকম ব্যাপার ঘটা কি সম্ভব? মনের সংশয় কাটাবার জন্যে টেপরেকর্ডারটা একবারের জায়গায় ডাঃ লক বারবার, অন্তত দশবার, চালিয়ে দেখলেন।

“না, তাঁর মনের ভুল নয়। সত্যিই কে একজন স্পষ্ট চলিত জার্মান ভাষায় ওই ক'টা কথা সেখানে রেকর্ড করিয়ে রেখেছে।

“কিন্তু কার দ্বারা, কেমন করে তা সম্ভব? এ-কাজ যে করেছে, তার তো এই অভিযানের সঙ্গেই থাকা দরকার। যে দুর্গম অজানা সব অঞ্চলের ভিতর দিয়ে চিংড়ি তাঁদের নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কারও অজান্তে তাঁর দলের রাস্তা ধরেই লুকিয়ে সঙ্গে থাকা প্রায় অসম্ভব।

“আর তা-ও যদি সম্ভব হয়, তা হলেও তাঁবুর ভেতর কখন কীভাবে ঢুকে সে এ-কাজ করবে? তাঁবুর মধ্যে তিনি নিজে অধিকাংশ সময় থাকেনই। আর তা ছাড়া লোধা-গোধা দু'জনেই সারাক্ষণ থাকে কড়া পাহারায়। চিংড়ির কথা ধরবারই নয়। তবু তাকেও বাদ না দিয়ে ডাঃ লক লোধা-গোধার সঙ্গে তাকে ডেকে অত্যন্ত কড়া ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

“লোধা-গোধা দু'জনেই তো ডাঃ লকের জেরা শুনে একেবারে হতভম্ব। এই সফরে তাদের সঙ্গে লুকিয়ে আসা কেমন করে সম্ভব?

“আর যদিও লুকিয়ে-চুরিয়ে কেউ তাদের কাছাকাছি আসতে পেরে থাকে, এ-তাঁবুর ভিতরে ঢুকে সাহেবের যন্ত্রপাতি ছোঁবার সময়-সুযোগ সে পাবে কী করে?

“লোধা-গোধার কাছে এর চেয়ে এ-রহস্যের হদিস পাবার মতো উত্তর লক আশা করেননি। তবু তাদের তিনি হয়রান করে মেরেছেন। সম্ভব-অসম্ভব হাজার রকম প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই বিদায় দিতে হয়েছে তাদের।

“লোধা-গোধার পর এ-ব্যাপারে হদিস পেতে জংলী চিংড়িকে ডাকার কোনও মানে হয় না।

“তবু কোনও দিকে ত্রুটি রাখবেন না বলে লক লোধা-গোধাকে দিয়ে তাকেও ডাকিয়ে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে চিংড়ির ভাষা কানুড়িতে তাকে জেরার ব্যবস্থা করেছেন। সে-জেরায় প্রথম প্রশ্নের উত্তরে চিংড়ির কথা শুনে কিন্তু তিনি থ। লকের হুকুমে লোধা-গোধা চিংড়িকে কানুড়িতে জিজ্ঞেস করেছিল, সে এ-তাঁবুতে কাজ করবার সময় আর কাউকে কখনও দেখেছে কি না।

“চিংড়ি তাতে যা উত্তর দিয়েছে তা শুনে একেবারে থ হয়ে লোধা-গোধা সেটা অনুবাদ করে লক-সাহেবকে বুঝিয়ে দিতেই গেছে ভুলে।

“লক তাদের হতভম্ব ভাব দেখে ধমক দিয়ে ওঠার পর তারা থতমত খেয়ে চিংড়ি যা বলেছে তা জানিয়েছে।

“চিংড়ি যা জানিয়েছে, তাতে তাদের হতভম্ব হবারই কথা অবশ্য। চিংড়ি বলেছে, সে নাকি তাঁবুতে রোজই আর-একজনকে দ্যাখে।

“‘রোজই আর-একজনকে দ্যাখে ? কখন ?’ লক লোধা-গোধাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করিয়েছেন।

“‘কখন আবার ?’ চিংড়ি জানিয়েছে, যতক্ষণ সে এ-তাঁবুতে থাকে, সারাক্ষণই।

“‘সারাক্ষণই ?’ লোধা-গোধার মারফত কথাটা শুনে কী মনে করবেন ভেবে না পেয়ে লক রাগে দাঁত খিচিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, ‘কোথায় ? এ-তাঁবুর কোথায়, কোন্‌খানে ?’

“লোধা-গোধার কাছে প্রশ্নটা শুনে নির্বিকারভাবে চিংড়ি যা

দেখিয়ে দিয়েছে, তাতে হাসবেন না জ্বলে উঠবেন ডাঃ লক তা ঠিক করতে পারেননি।

"চিংড়ি যা দেখিয়ে দিয়েছে সেটা তাঁবুর এক ধারে লকের চুল আঁচড়ানো, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম রাখার জন্য টেবিলের ওপর ঝোলানো একটা আয়না।

"জংলীটাকে তখনকার মতো হাসতে-হাসতে তাঁবু থেকে দূর করে দিলেও ব্যাপারটা নিয়ে লকের দুর্ভাবনা ক্রমশ চরমে উঠেছে।

"চিংড়ির দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে তখন তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছেন।

"কাঁটাঝোপের আধা-মরু পাথুরে ডাঙা পার হয়ে যেতে যেতে মাঝে-মাঝে ছোটখাটো হ্রদ আর শুকনো গভীর খাদ তাঁদের পথে পড়েছে। দূরে একটা আকাশ-ছোঁয়া যে পাহাড়ের চূড়া তাঁদের চোখে পড়েছে, সেটা ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরি ছাড়া আর কিছু নয় বলে বুঝেছেন লক।

"কিন্তু এই সময়ে এমন কিছু হয়েছে, যাতে তাঁর মাথা ঠাণ্ডা রাখাই শক্ত হয়ে পড়েছে। ব্যাপার যা ঘটেছে তা লকের টেপরেকর্ডারটা সম্পর্কেই।

"প্রথম সেখানে অজানা ভুতুড়ে কণ্ঠ শোনার পর বেশ কিছুদিন আর কিছু হয়নি। ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরি দেখার পরই একদিন সকালে টেপরেকর্ডারে আবার সেই ভুতুড়ে গলা হঠাৎ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, 'শোনো, শোনো ব্রুল', টেপরেকর্ডার থেকে পরিষ্কার জার্মান ভাষায় শোনা গেছে, 'যেখানে তুমি চেয়েছিলে সেখানে তুমি প্রায় পৌঁছে গেছ বললেই হয়। আর-একদিন কি একবেলা গেলেই নিয়ল হ্রদের কাছাকাছি তুমি পৌঁছে যাবে। কিন্তু নিয়ল হ্রদ কি ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরি তো সত্যিই তোমার লক্ষ্য নয়। তোমার আসল লক্ষ্য, এই অঞ্চলের অসংখ্য সব অজানা গুহা-গহ্বর। এমন অদ্ভুত সন্ধানে কেন তুমি এসেছ, তা যে আমি জানি, তা বুঝতে

পেরেছ কি ? না পেরে থাকলে দুনিয়ার সবাই যা জানে সেই পুরনো ইতিহাস তোমায় একটু স্মরণ করিয়ে দেব। একটা দিন শুধু ধৈর্য ধরো।'

"টেপরেকর্ডার ওইখানেই চুপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধৈর্য ধরবেন কী, রাগে, ভয়ে, দুর্ভাবনায় প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন ডাঃ লক। টেপরেকর্ডারের কথায় যাঁর আসল নাম লক নয়, ব্রুল।

"ভেতরে ভেতরে খেপে গেলেও ব্রুল এবার চেঁচামেচি করে লোধা-গোধা কি চিংড়িকে ডাকাডাকি করেননি। তার বদলে, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা দিয়ে টেপরেকর্ডারের সঙ্গে এমন ক'টা বৈদ্যুতিক তার লাগানো কলের ফাঁদ পেতে রেখেছেন যে, রেকর্ডারে কেউ হাত দিলেই একটা হঠাৎ ঝিলিক দেওয়া আলোয় গুপ্ত একটা ক্যামেরায় তার ছবি উঠে যাবে।

"ছবি ঠিকই উঠল। তবে তা ব্রুলের নিজেরই ছবি। রেকর্ডারের সঙ্গে ক্যামেরার গুপ্ত সংযোগের কৌশলটা করে রেখে ব্রুল সেদিন কাছাকাছি অঞ্চলের একটু ভাসা-ভাসা জরিপের কাজ করেছেন, সেখানকার গুহা-গহ্বর, ছোটখাটো পাহাড় টিবি হ্রদ ছকে রাখবার জন্যে। এ-কাজে লোধা-গোধা আর চিংড়ি তাঁবুর পাহারা ঠিকই রেখেছে, আর তাঁকে তাঁর দরকার-মতো সাহায্য করেছে।

"সন্ধেবেলায় ক্লান্ত হয়ে তাঁবুতে ফিরে প্রথমেই টেপরেকর্ডারের দিকে গিয়ে তাঁর ক্যামেরার ফাঁদ কী রকম কাজ করেছে দেখার ইচ্ছে হলেও তিনি নিজের ওপর রাশ টেনে রেখেছেন।

"তারপর লোধা-গোধা আর চিংড়ি তাঁবুতে তাদের কাজ সেরে চলে যাবার পর অতি সাবধানে রেকর্ডারের কাছে গিয়ে সেটা চালাবার সুইচ টিপতেই আচমকা সেই অদ্ভুত ব্যাপার।

"তাঁর নিজের পাতা ক্যামেরার ফাঁদে হঠাৎ আলোর ঝিলিকে তাঁর নিজেরই ফ্ল্যাশ ছবি উঠে গেছে। আর সেইসঙ্গে চালু হওয়া টেপরেকর্ডারের অজানা ভুতুড়ে গলায় শোনা গেছে, 'বড় দুঃখিত

বুল, তোমার পাতা ফাঁদে তোমাকেই কাবু হতে হল। কিন্তু এখন বাজে কাজে আর কথায় নষ্ট করবার সময় নেই। আসল কথা যা তোমায় বলতে চাই, তার জন্যে দুনিয়ার সকলের যা জানা নেই, সেই পুরনো ইতিহাসটা তোমায় নতুন করে একটু আগে শুনিয়ে দিতে হবে। আজ যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের এই অঞ্চলটা জার্মানদের অধিকারে ছিল। এখনকার জার্মানি নয়, আগেকার জার্মানি। প্রথম মহাযুদ্ধ হবার পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের অধীন জার্মান সাম্রাজ্যের অনেক কিছুর মধ্যে এইসব জায়গার অধিকারও ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের হাতে চলে গেছে।

"'পৃথিবীর নানা দেশ জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে ইংরেজরাই ছিল ইউরোপের আর-সব দেশের চেয়ে এগিয়ে। তখনও উড়োজাহাজের দিন শুরু হয়নি। পৃথিবীর সমুদ্রে-সমুদ্রে যার যত বেশি রণতরীর প্রাধান্য, তার সাম্রাজ্যও তত বিরাট। সেদিক দিয়ে ইংল্যাণ্ডের পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যেত না বলে ছিল ইংরেজদের গর্ব।

"'ইংরেজদের পরে এ-বিষয়ে দ্বিতীয় বৃহৎ বিশ্বসাম্রাজ্য ছিল ফরাসিদের। এই দুই জাতের পরে এদিকে দৃষ্টি দেয় বলে জার্মানির সাম্রাজ্য ছিল অনেক ছোট। কিন্তু পৃথিবীর যেটুকু জায়গা তারা অধিকার করেছিল, নানা দিকে তার উন্নতি বিধানের চেয়ে সেগুলি থেকে যতখানি সম্ভব সম্পদ সংগ্রহ করার ব্যাপারে তারা ছিল বুঝি সব দেশের চেয়ে অগ্রসর। এই অঞ্চলটাতেও তারা অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু বড় কাজ শুরু করেছিল। মহাযুদ্ধে হারের দুঃখ যেমন, তেমনি এইসব অধিকার হারাবার অপমান আর জ্বালা জার্মানদের অনেকেই ভুলতে পারেনি। আগের জার্মান সাম্রাজ্য লোপ পেলেও আবার নতুন করে পৃথিবী জয় করবার স্বপ্ন শুধু নয়, সে স্বপ্ন সফল করার সাধ্য-সাধনের জন্যে যারা গোপনে গোপনে তৈরি হচ্ছে, তাদের নেতার নাম অ্যাড্‌লফ হিটলার। হিটলার এখনও

একটা জঙ্গী দলের সর্দার মাত্র। দেশপ্রেমের নামে পৃথিবীর আর সব দেশকে পায়ের তলায় চেপে শুধু হিংসা-ঘৃণা-স্বার্থপরতাই যেখানে মানুষের ধর্ম, বিশ্বের সঙ্গে শুধু প্রভু আর ক্রীতদাসের সম্বন্ধে বাঁধা এমন এক দানবীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাই গড়ে তুলতে চাইছে সে।

"'এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইউরোপের অন্য দেশের তুলনায় জার্মানি যে বিজ্ঞানে কিছুটা বেশি অগ্রসর, তার প্রমাণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আকাশযান হিসেবে তার জেপেলিন তৈরি, সুদূর জার্মানি থেকে প্যারিসে গোলাবর্ষণ ইত্যাদির মতো ব্যাপারেই কিছুটা পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে গেলেও সেই বিজ্ঞান-উদ্ভাবন দিয়েই হিটলারের দল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে তা জিতবার স্বপ্ন দেখছে।

"'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যুদ্ধে-নামা ইউরোপের সব দেশই পয়জন গ্যাস অর্থাৎ বিষ-বাষ্প ব্যবহার করার কথা ভেবেছিল। নানারকম বিষ-বাষ্প উৎপাদন করে তা জমা করে একটু-একটু ব্যবহারের পর বিষ-বাষ্প যে আর ব্যবহার করা হয়নি, তার কারণ, ঢিলের বদলে পাটকেল খাবার ভয়। তখন যারা বিষ-বাষ্প তৈরি করেছিল, সে-সব দেশই তারপর সে-সব গ্যাস সাবধানে নানা জায়গায় জমা করে লুকিয়ে রাখে।

"'প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কাজে না লাগালেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা যে ব্যবহার হবে না, সে-কথা কে বলতে পারে! হিটলারের জার্মানি তাই অস্ত্র হিসেবে বিষ-বাষ্প জমা করে রাখতে চায়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে হেরে তার হাত-পা অনেক দিক দিয়ে বাঁধা। পয়জন গ্যাস বানাতে গেলে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাদের চোখে তা ধরা পড়বারই কথা। পড়লে সব মতলব ভেস্তে যাবে। এ-সঙ্কট কাটাবার উপায় বার করবার জন্যেই 'ডাঃ লক' নাম নিয়ে তোমার মতো গুপ্ত নাৎসী-র আসরে নামা। জার্মানি বিষ-বাষ্প খোলাখুলি এমনকী লুকিয়েও তৈরি করতে গেলে বিপদ আছে। তা থাক, বিষ-বাষ্প

উৎপাদনের বদলে কোনও অজানা জায়গায় মজুত গ্যাস জোগাড় করবার ব্যবস্থা করলে তো সেভাবে ধরা পড়বার ভয় নেই।

"'কোথায় কোন্ অজানা জায়গায় সেরকম মজুত লুকানো গ্যাসের সঞ্চয় আছে ? কোথায় আছে, তা আর কেউ না জানুক, জানে 'ব্রুল' নামে এক জার্মান ভবঘুরে আধা-বৈজ্ঞানিক। দুর্গম অজানা সব দেশে টহল দিয়ে নানারকম অদ্ভুত খবর সংগ্রহই যার নেশা।

"সেই ব্রুল, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির হার হওয়ার পর যুদ্ধের সময় জার্মানির হয়ে গুপ্তচরগিরি করার অপরাধে মিত্রশক্তির গোয়েন্দা-পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে যে নানা জায়গায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল।

"'জার্মানিতে হিটলারের অধীনে নতুন নাৎসী দল গড়ে ওঠে, আবার জার্মানির বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু হবার পর। আগের যুদ্ধের মজুত করা পয়জন-গ্যাস কাজে লাগতে পারে ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রুলের মনে পড়ে আগেকার এক আবিষ্কারের কথা। সে নতুন করে তা খুঁজে বার করবার কথা ভাবে।

"'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে তার ভবঘুরে টহলদারির সময় সে ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরির চারধারে ছোট-ছোট হ্রদ অঞ্চলে অনেক অনেক গুপ্ত হ্রদের গহ্বর দেখেছিল, যার ভেতর থেকে মাঝে-মাঝে বিষ-বাষ্প বেরিয়ে আশপাশের জংলীদের বসতিতে মড়ক লাগাত। সে তখনই বুঝেছিল যে, এইসব গুপ্ত হ্রদের গহ্বরের তলায় এমন প্রচুর বিষ-বাষ্পের সঞ্চয় আছে, যা বাইরে ছাড়া পেলে সারা দেশে মড়ক বাধিয়ে দিতে পারে। জার্মানির হারের পর সেখানকার অনেক পুরনো পাপী নাম ভাঁড়িয়ে যথাসম্ভব চেহারা পালটে ভিন্ দেশে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল। সে-চেষ্টায় সফল তারা সবাই হয়নি। আসল পাপীরা অধিকাংশই ধরা পড়ে, তাদের উচিত-শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। শুধু পাকা শয়তানদের তালিকা দেওয়া খাতায় তোমার নাম ছিল না বলে নয়, জার্মানির ভাগ্যের আকাশ যে অন্ধকার

হয়ে আসছে, তা একটু আগে থাকতে বুঝে ইউরোপ ছেড়ে এই আফ্রিকায় এসে লুকোবার জন্যেও তুমি এ-যাত্রায় বেঁচে গেছ।

"'এই জংলা প্রবাসে কখনও খেয়ালি ভবঘুরে, কখনও টহলদার খ্রিস্টান সাধু সেজে তুমি ক্যামেরুন-আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে নিয়ল হ্রদের আশেপাশে গুপ্ত সব বিষ-বাষ্পের যেমন সন্ধান পেয়েছ, তেমনি জার্মানিতে কে এক অ্যাডলফ্ হিটলারের অধীনে জার্মানিকে আবার বিশ্বজয়ী করে তুলবার জন্যে এক নাৎসী দলের অভ্যুত্থানের কথাও শুনেছ।

"'এরপর লুকিয়ে বার-কয়েক ইউরোপ গিয়ে হিটলারের চেলা-চামুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করে তুমি তোমার আবিষ্কার-করা পয়জন-গ্যাসের সঞ্চয়ের কথা জানিয়ে তার সঠিক-হদিস-জরিপ-করে-দেওয়া মানচিত্র প্রস্তুত করে রাখবার জন্য আবার এই ক্যামেরুনসে রিও দে কার্মার্দে মানে চিংড়ি নদীর মোহানায় এসে নিয়ল হ্রদের অঞ্চলে যাবার সবচেয়ে সোজা আর নিরাপদ রাস্তা দেখাতে এই এক জংলী চিংড়িকে কাজে লাগিয়েছ।'"

ঘনাদা যে ফের মুখ বন্ধ করেছেন, তার কারণ অবশ্য আর কিছু নয়, ইতিমধ্যে আর-এক প্রস্থ চা এসে গিয়েছিল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, শিশিরের টিন থেকে সিগারেট ধরিয়ে, তিনি আবার গল্পের খেই ধরলেন।

"দাঁতে দাঁত চেপে টেপরেকর্ডারের কথা শুনতে শুনতে ব্রুল হঠাৎ চমকে উঠে টের পায়, যে-কথাগুলো সে শুনেছে, সেগুলো টেপরেকর্ডার থেকে নয়, তাঁবুর মধ্যে এইমাত্র ঢোকা সেই জংলী চিংড়িটার মুখ দিয়েই বার হচ্ছে।

"জংলীটা কয়েক সেকেণ্ড আগে যেরকম বেপরোয়াভাবে তাঁবুর ভেতর এসে টেপরেকর্ডারটা বন্ধ করে দিয়ে নিজেই কথা বলতে শুরু করেছিল তাতে হতভম্ব বিহ্বল হয়ে ব্রুল তো তখন প্রায় তোতলা।

"'তু-তু-তু, মানে আপ-আপ-আপ, মানে আপনি', বলে আড়ষ্ট জিভটায় সাড় ফেরাবার চেষ্টায় তার মুখটা তখন লাল হয়ে উঠেছে।

"'থাক, থাক !' বলে বেশ একটু ঠাণ্ডা গলায় তাকে থামিয়ে চিংড়ি বললে, 'আমার মতো জংলীর মুখে সামান্য একটু জার্মান শুনে 'তুই' থেকে অমন 'আপনি'তে উঠতে হবে না। তার বদলে শির-ছেঁড়া সন্ন্যাস-রোগ থেকে নিজেকে বাঁচাতে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথাগুলো শোনো।'

"কিন্তু ব্রুল তখন রাগে অপমানে একেবারে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার। 'তুই, তুই, বলে মুখ দিয়ে যেন লাভা ওগরাতে ওগরাতে তাঁবুর ভেতর হঠাৎ যমজ ঘটোৎকচের এক ভাই গোধাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বললে, 'কী করিস তোরা ? কী জন্যে এত টাকা দিয়ে তোদের পাহারায় রেখেছি ? কী বলে ওই চিংড়িটার মতো শয়তানকে আমাদের কাজে নিয়েছিস ? আমি তোদের সকলকে গুলি করে মারব। হ্যাঁ, গুলি করে···। তার আগে এই চিমসে চিংড়ি চামচিকেটাকে তাঁবু থেকে বার করে নিয়ে···বার করে নিয়ে, হ্যাঁ, ওই নিয়ল হ্রদের ধারে একটা বিষাক্ত গ্যাসের গহ্বরে, হ্যাঁ, ওই গহ্বরেই ফেলে দিয়ে আয়।'

"ব্রুল সাহেবের এ-মূর্তি গোধা কখনও দ্যাখেনি। সে একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'গর্তে ফেলে দেব ? ওই বিষাক্ত গ্যাসের গহ্বরে ?'

"'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই ফেলবি', ব্রুল গর্জন করে উঠল, 'ছোটখাটো নয়, সবচেয়ে গভীর যে গহ্বর, সেইটাতে। কী করেছে এই চিমসে চিংড়িটা তা জানিস ? জানিস ওকে··· ?'

"কিন্তু সেসব কথা শোনার জন্যে গোধা আর তখন সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। চিংড়িকে দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরে সে তখন তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে।

"তারপর কতক্ষণ বা আর, পাঁচ, বড়জোর সাত মিনিট, কী করবে

ঠিক করতে না পেরে ব্রুল তখন তার তাঁবুর ভেতর খাঁচায় ভরা বাঘের মতো এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করছে।

"'সেলাম সাহেব !' তার অস্থির পায়চারির মধ্যে ডাকটা শুনে ব্রুল চমকে ফিরে তাকিয়ে অবাক।

"তাকে তাঁবুর দরজার পর্দা সরিয়ে ডাকছে লোধা কি গোধা নয়, ডাকছে চিমসে চিংড়িটা।

"'অ্যাঁ, তুই !' ব্রুলের গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে বেশ একটু ভয় মেশানো, 'গোধা কোথায় গেল ?'

"'কোথাও যায়নি', চিংড়ি যেন আশ্বাস দিয়ে বোঝাল, 'তবে একটু ভাল ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর আপাতত একটু টিংচার আয়োডিন।'

"'টিংচার আয়োডিন ?' ব্রুল যেন রাগে-দুঃখে চিৎকার করে উঠল, 'এমন অবস্থা হয়েছে যে, টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দরকার ? লোধা, লোধা, লোধা কোথায় ?'

"'না না, তার তেমন কিছু হয়নি', চিংড়ি আশ্বাস দিলে, 'সে-ই তো দাদা গোধাকে বয়ে আনছে। তেমন জখম হলে কি পারত ?'

"'জখম হয়েও সে-ই দাদাকে বয়ে নিয়ে আসছে ?' ব্রুলের গলায় যেন রাগ-দুঃখ মেশানো আর্তনাদ ঠেলে উঠছে, 'এখন আমি কি করব বলতে পারো কেউ ?'

"'আমি পারি', চিংড়ি সান্ত্বনা দিয়ে বললে। তাতে ব্রুল আবার জ্বলে উঠল। হঠাৎ একটা ড্রয়ার থেকে তার রিভলভারটা বার করে চিংড়ির দিকে সেটা উঁচিয়ে ধরে সে গর্জন করে বললে, 'তোকে আমি গুলি করে মারব। যা তোর নাম, সে-ই চিংড়ি কি ইঁদুরের মতো।'

"রিভলভারের সামনে দাঁড়িয়েও চিংড়ি কি নির্বিকার ? 'না', রীতিমত যেন ভয় পেয়ে সে বললে, 'থামো, থামো ব্রুল, হুট করে এমন যা-তা করে ফেলো না। ও রিভলভারে আমাকে মারলে কী হবে তা একটু ভেবে দেখেছ ? আমায় গুলি করে মারা মানে তোমার

কী ভয়ানক বিপদ ?'

"'তোকে মারলে আমার বিপদ ?' ব্রুল জ্বলে উঠে বললে, 'তোর মতো একটা ছুঁচোকে মারলে...'

"'থামো, থামো,' চিংড়ি যেন কাতর মিনতি করে বললে, 'নেহাত যদি মারতেই চাও তো আমার পরিচয়টা তার আগে একবার ঠিক করে জেনে যাও। আমায় একবার বলছ ইঁদুর, তারপরে আবার চিংড়ি, তারপর আবার বললে ছুঁচো। আমি তোমার চোখে ঠিক কোন্‌টা সেইটা মরার আগে-আগে জেনে যেতে চাই। সেই সঙ্গে এটুকু শুধু নিবেদন করতে চাই যে, চিংড়ি, ইঁদুর কি ছুঁচোকে কেউ গুলি করে মারে না। তাদের...'

"'তুই...তুই...', রাগে প্রায় তোতলা হয়ে ব্রুল গর্জন করে বলবার চেষ্টা করলে, 'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে রসিকতা করছিস ? এত বড় তোর সাহস ? ভাবছিস, তোকে আমি গুলি করে মারতে পারি না ? তোর মতো একটা ছুঁচো, একটা চামচিকে...'

"'থামো, থামো', চিংড়ি এবার ঠাণ্ডা গলায় ব্রুলকে যেন শান্ত করতে চাইলে, 'ছুঁচো, চামচিকে, ইঁদুর, চিংড়ি—যা-ই আমি হই না কেন, আমায় গুলি করে নিশ্চয়ই তুমি মারতে পারো, কিন্তু মারলে কী হবে তা একটু ভেবে দেখেছ ?'

"'কী ভেবে দেখব ?' ব্রুল চিৎকার করে বললে, 'তোকে মারলে কোন্ আইনে কে আমাকে এখানে ধরবে ? তোকে এই রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা করে লাশটা শুধু ওই একটা বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় ফেলে দেব।'

"'হ্যাঁ, তা দিতে পারো,' চিংড়ি যেন তা স্বীকার করে নিয়ে বললে, 'কিন্তু তারপর ?'

"'তারপর মানে ?' ব্রুল দাঁত খিচিয়ে বললে, 'তারপর আবার কী ?'

"'তারপরই যত গণ্ডগোল', যেন দুঃখের সঙ্গে জানালে চিংড়ি।

"'তারপরে গণ্ডগোল ? তোর মতো একটা…তোর মতো একটা…'

"ব্রুলকে তার তোতলামির মধ্যে থামিয়ে দিয়ে চিংড়ি বললে, 'হ্যাঁ, আমার মতো ছুঁচো, ইঁদুর, চামচিকে, চিংড়ি, যা-ই বলো, তাকে মারার পর কত গণ্ডগোল শুরু, তা বুঝতে পারছ না ? শোনো, বুঝিয়ে বলি। আমার মতো একটা ইঁদুর, চামচিকে, চিংড়ি যা-ই বলো, তাকে তোমার রিভলভারে ঝাঁঝরা করে একটা বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় না-হয় ফেলে দিলে। কিন্তু তারপর তুমি নিজেই যে একেবারে অথৈ গাড্ডায় পড়বে, তা বুঝতে পারছ কি ?'

"'তোকে পাতাল-গুহায় ফেলে আমি অথৈ গাড্ডায় পড়ব ?' কথাগুলো রাগে গর্জন করে বলবার চেষ্টা করলেও ব্রুল তার হতভম্ব ভাবটা ঠিক লুকোতে তখন পারছে না। সে-ভাবটা যথাসাধ্য চাপা দিয়ে তবু দাঁত খিঁচিয়েই বললে, 'কেন ? তুই ভূত হয়ে আমায় গাড্ডায় ঠেলে দিবি ?'

"'না না, ভূত হতে হবে কেন আমাকে ?' চিংড়ি বোঝাবার চেষ্টা করলে, 'আমি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে কোনও পাতাল-গুহায় তলিয়ে গেলে তোমার কী অবস্থা হবে তা একটুও বুঝতে পারছ না ? বুঝতে পারছ না যে, আমি না থাকলে তুমি তোমার ওই লোধা-গোধাকে নিয়েও কী অসহায় ! ভুলে যাচ্ছ কেন যে, এই অজানা মরু-পাহাড়-জঙ্গলের দেশে আমি পথ দেখিয়ে তোমাদের নিয়ে এসেছি। আমি না থাকলে সারা জীবন খুঁজে-খুঁজেও এখান থেকে উদ্ধার পাবার পথের হদিস পাবে না। সুতরাং আমার লাশ যদি বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় পড়ে থাকে, তা হলে তোমার লাশও এখানকার মরু-পাহাড়-জঙ্গলে কোথাও রোদে-বৃষ্টিতে শুকোবে কি পচবে, কিংবা এখানকার সিংহ-চিতা-নেকড়ের মতো হিংস্র প্রাণীদের পেটেও যেতে পারবে। তাই বলছি, আমায় মারার মতো অমন ভুল করার চেষ্টাও কোরো না।'

"একটু থেমে চিংড়ি আবার বললে, 'গুলি করেও কোনও লাভ

নেই অবশ্য। তোমার ওই রিভলভার আমি আগে দেখিনি মনে করছ ? এর মধ্যে আমায় মারবার মতো একটি গুলিও আমি কি রেখেছি ? সুতরাং শান্ত হয়ে আমার কথা শোনো। শোনো, দেশকে ভালবাসো বলে নাৎসীদের দলে একসময় ভিড়েছিলে বটে, কিন্তু নীচ নোংরা কাজ কখনও করোনি। তা ছাড়া এককালে খ্রিস্টান সাধু হয়ে আফ্রিকার এই ক্যামেরুনস অঞ্চলের হতভাগ্য অধিবাসীদের মধ্যে থেকে তাদের সেবায় জীবন কাটিয়ে তাদের উন্নতির জন্যে যা দরকার, তা করবার ইচ্ছে তোমার ছিল। আজ আবার সেই সুযোগই তোমার এসেছে। এই আগ্নেয়গিরির অজানা অঞ্চলে অসংখ্য বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহা আছে। সেইসব গোপন গুহা থেকে বিষাক্ত গ্যাস মাঝে মাঝে বেরিয়ে আদিবাসীদের সব বসতি ধ্বংস করে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। তাদের রক্ষা করবার ব্রত নিয়ে তুমি এই অঞ্চলে নিশ্চয়ই একটি মঠ গড়ে তুলতে পারো। সেই মঠ ধর্মের জন্যেও যেমন, বিজ্ঞানের গবেষণাতেও তেমনি তন্ময় হয়ে থাকবে। অন্যসব কাজের মধ্যে এখনকার বিষ-বাষ্প জমানো গুপ্ত গুহার খবর রাখাই হবে তোমার মঠের প্রধান দায়িত্ব। এখানে সেরকম কিছু বেয়াড়া ব্যাপারের আভাস পেলেই তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো তোমার জংলী আদিবাসী ভক্তদের দিয়েই রাজধানীতে না পারো অন্য কোনও ব্যবসার ঘাঁটিতে খবর পাঠাবে। সময়ে খবর পেলে এ বিষ-বাষ্পের সর্বনাশা ক্ষতি হয়তো ঠেকানো যাবে।'

"চিংড়ির কথা শুনে ব্রুল সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে ওই নিয়ল হ্রদের কাছেই তার মঠ স্থাপনা করেছিল। অন্তত করেছিল বলেই আমার ধারণা। গুপ্ত সব গুহা থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে যে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ এবার হয়ে গেল, তার আভাস পেয়ে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রুল তা জানাবার জন্যে তার আদিবাসী দূতকে নানা জায়গায় পাঠিয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই ফাং থেকে ফুলানি থেকে হাউসায় কথা চালাচালি করায় কোথাও-না-কোথাও ভুল হওয়ার জন্যেই সে-খবর

আমাদের সভ্য জগতে পৌঁছায়নি। কিংবা...”

“কিংবা কী ঘনাদা”, আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

“কিংবা...” ঘনাদা একটু ধীরে-ধীরে বললেন, “সেই চিংড়ির সঠিক পরিচয় জানার কৌতূহলটা তার কাছে এত বড় হয়েছে যে, সেই সন্ধানে বেরিয়ে আর তার আফ্রিকায় ফিরে মঠ গড়া হয়নি।”

“সত্যিই দুঃখের কথা,” সহানুভূতি জানিয়ে আমরা বললাম, “কিন্তু ওই চিংড়ি সত্যিই কে বলুন তো ঘনাদা ?”

বনোয়ারির হাতে খাবারের প্লেট সাজানো ট্রে তখন এসে পড়েছে। ঘনাদার কাছে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

ভেলা

অবিশ্বাস্য ! অভূতপূর্ব ! কল্পনাতীত !

ঠিকানা—বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেন ।

স্থান—দোতালার আড্ডা ঘর ।

সময়—শুক্রবার সন্ধ্যা ছটা ।

কুশীলব—শিবু শিশির গৌর আমি রামভুজ ।

না, হল না । ঘনাদার নামটাই বাদ নাকি ? তাঁর নাম তাহলে যাবে কোথায় ? শেষে ?

হ্যাঁ, পূজো সংখ্যার বিজ্ঞাপনে নাম-করা কোন কোন লেখককে মাথার ওপরে না তুলে আরো খাতির বাড়াতে একটি 'এবং'-এর নকীবের পেছনে যেমন সকলের শেষেই আলাদা করে রাখা হয়, ঘনাদার নামটাও তেমনি আমাদের ক'জন 'গার্ড অফ অনার'-এর পেছনে ভিন্ন সারিতে একেশ্বর হয়েই থাক ।

কিন্তু এ পর্যন্ত যা বলেছি তাতে অনেকের ভুরুই কুঁচকে উঠেছে বুঝতে পারছি । বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের দোতালার আড্ডা ঘরে শুক্রবার সন্ধ্যা ছটায় ঘনাদার সঙ্গে আমরা চারজন উপস্থিত থাকব এ ত নেহাত মামুলী রুটিন মাফিক ব্যাপার । অদ্ভুত

কিছু ত নয়!

কিন্তু রামভুজ সেই সঙ্গে কেন?

হিঙের কচুরির ঝুড়ি, কি ট্রে-তে করে মাংসের সিঙাড়ার প্লেট নিয়ে নিশ্চয়।

না, হল না।

কচুরির ঝুড়ি কি মাংসের সিঙাড়া আনবার জন্যে বনোয়ারী থাকতে রামভুজ আসবে কেন?

ঘটনাটা তাহলে কি?

ঘটনাটা একেবারে অবিশ্বাস্য! অভূতপূর্ব! কল্পনাতীত!

রামভুজকে নিয়ে আমাদের পাঁচজোড়া চোখ বিস্ফারিত বিস্ময়ে ঘনাদার কোলের ওপর রাখা দক্ষিণ হস্ত আর সে হাতের একটি কাগজের দিকে নিবদ্ধ হয়ে আছে।

কেন? কিসের কাগজ সেটা? সিমলা প্যাক্টের খসড়া? নিক্সন-চৌ-এন-লাই-এর গোপন চুক্তির দলিল?

না, সে সব কিছু নয়।

ঘনাদার হাতে একটি নতুন ঝকঝকে মেটে সিঁদুরের রঙের কুড়ি টাকার নোট!

তা কুড়ি টাকার নোট ঘনাদার হাতে একটা থাকতে পারে না? নতুন কি রকম নোট বেরিয়েছে দেখাবার জন্যে শিশিরই হয়ত সেটা তাঁর হাতে দিয়েছে।

না। এবারও হল না।

ঘনাদা নিজের পকেট থেকেই নোটটা বার করেছেন আর বার করে রামভুজকেই ডেকে পাঠিয়ে তাকে হুকুম দিচ্ছেন।

কি হুকুম?

অতি সাদাসিধে কটা ফরমাশ। বলছেন,—তুমি বিরিয়ানি পোলাওই বানাও রামভুজ, আর চিংড়ির মালাই কারি। নিউমার্কেটে গেলে এই বিকেলেই একেবারে পয়লা নম্বর গলদা চিংড়ি পাবে।

দামের পরোয়া কোরো না। এ কুড়ি টাকায় না হয় আরো যা লাগে নিয়ে যাও...

ঘনাদা পকেট থেকে অকাতরে আর একটা কুড়িটাকার নোট বার করে আগেরটার সঙ্গে রামভুজের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো। না হয় আসবার সময় একটা ট্যাক্সি নিয়েই এসো। ট্রাম-বাসের যা অবস্থা।

যেন দম দেওয়া পুতুলের মত হাঁ করা মুখে ঘনাদার হাত থেকে টাকা নিয়ে চলে যেতে গিয়ে রামভুজকে আবার দাঁড়াতে হল।

ঘনাদা ডেকেছেন।

হ্যাঁ, শোনো রামভুজ। সোনাই যখন হল তখন সোহাগাটা বাকি থাকে কেন ? সেমুই পায়েসের ব্যবস্থাও কোরো। কিসমিস বাদাম পেস্তা কিছুর যেন খামতি না হয়। পেস্তার আজকাল আবার সোনার চেয়ে পায়া ভারী। বাজারে সরেস পেস্তা পাওয়াই ভার। যা দাম চায় দিয়ে নিয়ে আসবে। বুঝেছ ?

হাঁ হুজুর—বলে যেরকম চেহারা করে রামভুজ বেরিয়ে গেল তাতে 'সরিষার বেল দুটো পাকা তেল' নিয়ে ফিরলে খুব আশ্চর্য হব না।

বিবরণ যা দিলাম তা কি স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে ?

না, স্বপ্ন নয়, একেবারে নির্ভেজাল সত্য।

বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনে সত্যিই পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে গেছে। ঘনাদা নিজের পকেট থেকে টাকা বার করে ভূরিভোজের বাজার করতে পাঠিয়েছেন আর তারপর যা করেছেন তা মাথায় চরকিপাক লাগাবার মত।

টাকার পকেট নয়, অন্য পকেট থেকে সিগারেটের একটা আস্ত টিন বার করে এয়ারটাইট ঢাকনা খুলতে খুলতে বলেছেন,—'হিস্'টা শুনতে পেলে ?

গোড়াতেই যে বিশেষণগুলো দিয়ে এ গল্প শুরু এবার সেগুলো

লাগসই মনে হচ্ছে কি না ?

কার চোখ কতখানি ছানাবড়া হতে পারে তার নমুনা দেখিয়ে আমরা এবার একেবারে বোবা বনে গেছি।

শিশিরই সকলের মহড়া নিয়ে ঘনাদার বেপরোয়া বদান্যতায় তাঁর ওপর প্রথম দরদ দেখালে।

দমকা এতো বাজে খরচ কিন্তু না করলেও পারতেন। সব ভূত-ভোজন বই ত কিছু নয়।

ভূতেরাও শিশিরের সঙ্গে জুড়ি গাইতে দেরী করলে না।

ঠিক ঠিক—শিবু বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে, বিরিয়ানি হচ্ছিল হচ্ছিল, তার ওপর ওই সেমুই-এর পায়েসের কি দরকার ছিল ?

আর পায়েসই না হয় হোলো তাতে আবার পেস্তা কেন ? গৌর তার চরম আপত্তির কারণ জানালে,—কাজু কুচি কুচি করে দিলে সোয়াদ কিছু কম হত ?

ঘনাদার ওই ত দোষ !—আমি ঘনাদার আখের ভেবে চিন্তিত হয়ে উঠলাম,—পয়সার মায়া করতে কোনদিন শিখলেন না। দুহাতে এমন করে খরচ করলে কুবেরের ভাঁড়ারেও যে টান পড়ে।

না।—হঠাৎ যেন সঙ্কল্প স্থির করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করলাম,—রামভুজ এখনো বেশীদূর যেতে পারেনি বোধহয়। তাকে ফিরিয়েই আনি।

থাক থাক।—শিবু শিশির গৌর তিনজনেই শশব্যস্ত হয়ে আমাকে থামালে,—ঘনাদাকে মিছি মিছি কষ্ট দিয়ে লাভ কি ? ওঁর চিরকেলে খরচের হাত আমরা একদিন সামলে আর কত বাঁচাব !

বেশ তোমরা বলছ যখন তখন বসছি।—আমি যেন নেহাত অনিচ্ছাভরে আবার বসলাম,—কিন্তু উনি দিলদরিয়া বলে ওঁর মাথায় এমন করে হাত বুলিয়ে এতগুলো টাকা খসানো কি উচিত হল ? আজই বোধহয় ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছেন।

ব্যাঙ্ক শুনে একটু কাসির ছোঁয়াচ লাগবার উপক্রম হয়েছিল।

ঘনাদার মৃদু হাসির সঙ্গে মাথা নাড়াতেই তা থেমে গেল।

না, ব্যাঙ্ক থেকে তোলবার দরকার হয়নি।—ঘনাদা হেসে আমাদের আশ্বস্ত করলেন,—ওই তোমাদের উর্তাদো কার্লসের চিঠিটা আজ এল কি না!

হুর্তাদো কার্লসের চিঠি!—একটু অবাক হবার পরই আমাদের স্মরণশক্তি আবার যেন ফিরে পেয়েছি,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ কি একটা চিঠি যেন সকালে এসেছিল বটে।

ব্রেজিলের কনসালেট থেকে পিয়ন বই-এ পাঠিয়েছিল, না?—শিশির আমাদের সমর্থন চাইলে।

ডাকে এলে তবু স্ট্যাম্পগুলো পেতাম। আমরা আবার বলাবলি করলাম।—গৌর ঘটনাটা সঠিক ভাবে স্মরণ করলো।

তা সেটা বুঝি এই উদো বুধো কি নাম বললেন, হুর্তাদো না কি, তারই চিঠি? সে-ই ব্রেজিল থেকে লিখেছে—উত্তরটা ঘনাদার কাছেই চাইলাম,—কিন্তু ব্রেজিল থেকে লেখা চিঠি সোজা ডাকে না এসে কনসালেটের মারফত এল কেন?

কেন এল তা বুঝিস না?—শিবু আমায় ধমকালে,—ঘনাদার কাছে কি 'কেমন আছো, ভালো আছি' গোছের চিঠি আসে? আসে সব অত্যন্ত গোপন জরুরী চিঠি! ডাকে মারা কি চুরি যাবার ভয়েই সেগুলো সরকারী জিম্মায় পাঠানো হয়। বুঝলি?

বুঝতেই হল সসম্ভ্রমে। জিজ্ঞেস করতেও হল ঘনাদাকে,—সেইরকম দামী চিঠি বুঝি? খুব গোলমেলে আন্তর্জাতিক ফ্যাসাদ-ট্যাসাদ বোধহয়?

না।—ঘনাদা যেন আমাদের হতাশ করতে পেরে খুশি—দামী চিঠি হলেও কোন ফ্যাসাদ-ট্যাসাদের ব্যাপারে লেখা নয়। বরং ফ্যাসাদ কেটে যাবার তারিখটা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জানাবার।

ওঃ কৃতজ্ঞতা জানাবার চিঠি!—গৌরের গলায় একটু যেন সংশয়ের খোঁচা,—সে চিঠিও এমব্যাসী মারফত পাঠিয়েছে পাছে মারা

যায় বলে !

না, মারা যাবার ভয়ে নয়।—ঘনাদা আমাদের সংশোধন করলেন,—আমার টাকা ভাঙাবার হ্যাঙ্গামা বাঁচাবার জন্যে।

টাকা ভাঙাবার হ্যাঙ্গামা !—আমরা যতখানি সম্ভব হাঁদা সেজে হাঁ করে রইলাম ঘনাদার দিকে তাকিয়ে।

ঘনাদা ব্যাখ্যা দিয়ে সে হাঁ বোজাবার ব্যবস্থা করলেন,—এ তারিখটায় একটু উৎসব করবার জন্যে উর্তাদো কিছু টাকা পাঠিয়েছে কিনা ! ব্রেজিলের কারেন্সী ভাঙাতে পাছে অসুবিধা হয় তাই এখানকার এমব্যাসীকেই ভারতীয় মুদ্রায় বদল করে সে টাকা আমার কাছে তার চিঠিটার সঙ্গে পৌঁছে দিতে লিখেছে।

খুব বুঝদার বন্ধু ত আপনার ওই হুর্তাদো !—আমরা তারিফ করে তারপর আমাদের আশাটা জানিয়েছি—সব দিক ভেবে তার মুশকিল আসানের তারিখ স্মরণ করে উৎসব করতে মোটা কিছু আপনাকে পাঠিয়েছে নিশ্চয় ?

হ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকা ত দেখছি।—বলেছেন ঘনাদা খুশি মুখে বেশ একটু গর্বভরেই।

পঞ্চাশ টাকা ?—ছি-ছি-ছি-টা স্পষ্ট না উচ্চারণ করলেও আমার গলার স্বরে আর মুখের চেহারায় গোপন থাকে নি।

পঞ্চাশ ?—শিবুর যেন অপমানে গলাটা বুজে এসেছে !

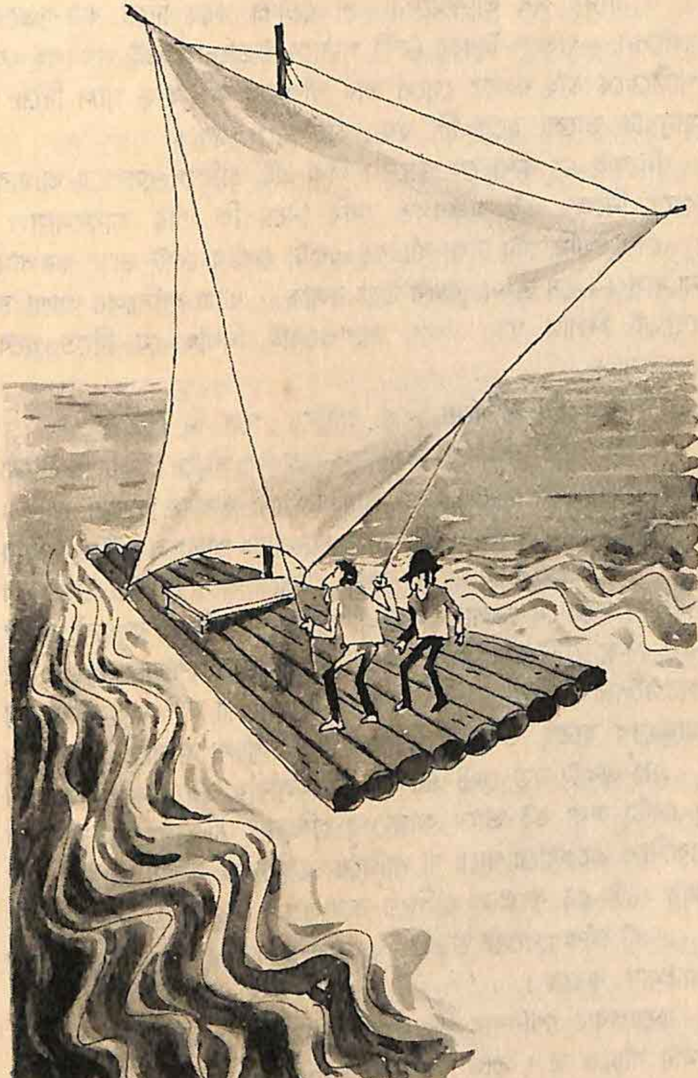
মাত্র পাঁচ দশে পঞ্চাশ সেই ব্রেজিল থেকে ?—শিশিরের গলায় ধিক্কার।

ওই টাকা ভাঙাবার হ্যাঙ্গামা বাঁচাতে আবার এমব্যাসীর মারফত পাঠানো ?—আর গৌরের গলায় বিদ্রূপ।

ঘনাদাকে একটু দিশাহারা করা গেছে কি ? আহ্লাদে গদ্গদ মুখটা একটু চুন ?

না, তা আর পারা গেল কই !

ঘনাদার মুখে তখন একটু ক্ষমা আর প্রশ্রয়ের হাসি।



আমাদের সব আক্রমণের বাণ ভোঁতা করে দিয়ে করুণাভরে বললেন,—পঞ্চাশ টাকার বেশী পাঠাবে উর্তাদো ! ওই পঞ্চাশই যে পাঠিয়েছে তাই বলতে গেলে তার পাঁজরার কটা হাড় খুলে দিয়ে। মানুষটা ভালো হলে কি হয় হাড়কঞ্জুস যে।

নিজেই সে কথা সে জানে। ঠিক এই তারিখে সেরাত্রে আমার কাছে নিজের এই মজ্জাগত দোষ নিয়ে কি তার আফসোস !

কেন আমি কটা টাকা বাঁচাতে একটা মোটর বোট ভাড়া করলাম না দাস !—সে তখন ডুকরে উঠে বলছে,—কাজ হাসিলের আশা ত ছেড়েই দিলাম, তার আগে প্রাণগুলোই নির্ঘাৎ যে দিতে হবে বেঘোরে !

তা অবস্থাটা উর্তাদো কিছু বাড়িয়ে বলে নি।

ঝড়ের রাতে দক্ষিণ আটলাণ্টিকের অকূল সমুদ্রে একটা ওল্টানো ভেলা ধরে কোনরকমে আমি আর উর্তাদো তখনও ভেসে আছি। এক একটা পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ যেন একেবারে পাতালে পৌঁছে দেবার জন্যে থেকে থেকে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে আসছে। কি ভাগ্যি যে শনগাদা মানে যে ভেলা আমরা আঁকড়ে ধরে আছি তা কখনো ডোবে না। কিন্তু ঢেউ-এর প্রচণ্ড ঘায়ে সে ভেলার শোলার মত হাল্কা কাঠগুলোর কাঠের গজাল ঠোকা বাঁধন আলগা যদি নাও হয়ে যায় আমাদের হাতই ত অবশ অসাড় হয়ে খুলে আসতে পারে।

এক একটা বড় ঢেউ-এর ধাক্কা সামলাবার ফাঁকে ফাঁকে সামান্য দু-একটা কথা ওই ভাবে আমাদের হচ্ছিল। তাও দুজনেই ভেলার একদিকে একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে ভাসছিলাম বলেই ঝড়ের গর্জন আর ঢেউ-এর কল্লোল ছাপিয়ে কথাগুলো কিছুটা কানে যাচ্ছিল।

একটু ফাঁক পেলেই উর্তাদো তখন ওইরকম নিজেকে ধিক্কার দিয়ে আর্তনাদ করছে।

কয়েকবার শোনবার পর ধমক দিয়ে বললাম,—একটু চুপ করে দমটা বাঁচাও ত ! তুমি কঞ্জুস ঠিকই, কিন্তু মোটর বোটের বদলে

শনগাদা নিয়ে পাড়ি আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছি। শক্ত করে যদি শেষ পর্যন্ত ধরে থাকতে পারো তাহলে এই শনগাদাই বাঁচাবে এটুকু বলতে পারি।

একদমে এতগুলো কথা অবশ্য বলিনি। বার চারেক বড় ঢেউ-এর ফাঁকে ফাঁকে ভাগ ভাগ করে উর্তাদোকে এ আশ্বাস দিতে হয়েছে।

আশ্বাস পাক না পাক উর্তাদো চুপ হয়ে গেছে তারপর। পূবের আকাশ লাল হয়ে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থেমে গিয়ে ঢেউগুলোও শান্ত হয়ে এসেছে।

ঝড় থেকে বাঁচলেও উর্তাদোর তখন আর এক কাঁদুনি শুরু।

সভয়ে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখে বলেছে,—আমাদের অবস্থাটা এখন কি তা বুঝতে পারছ দাস?

খুব বুঝতে পারছি।—মাথার এনামেল করা টুপিটা এক হাতে খুলে তা থেকে একটা বড়ি বার করে উর্তাদোর মুখেই একরকম পুরে দিয়ে বলেছি,—যে দিকে চাই কূল নেই কোথাও। একটা ওল্টানো শনগাদা ধরে ভাসছি। মাথায় একটা টুপিই শুধু ভরসা।

এখনো তুমি ঠাট্টা করতে পারছ!—উর্তাদো প্রায় ককিয়ে উঠলো।

ঠাট্টা নয় উর্তাদো!—গম্ভীর হয়েই তাকে বললাম এবার,—সত্যিই মাথার এই টুপি আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা। যা ধরে এখনো টিকে আছি সেই শনগাদা নিয়ে ব্রেজিলের এই উত্তর-পূবের রাক্ষুসে সমুদ্রের সঙ্গে মাছের জন্যে যারা লড়ে সেই দুর্ধর্ষ শনগাদেইরো-দের শেষ সহায় এই টুপি। কোমরে বাঁধা ছোরা আর মাথার এই টুপির জোরে তারা শনগাদার এই ক্ষুদে ভেলায় সমুদ্রের যে কোন ভ্রূকুটিকে তুড়ি দিয়ে অগ্রাহ্য করে।

কিন্তু টুপি থেকে তুমি আমার মুখে দিলে কি?—উর্তাদো সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

দিলাম একটা ভয়-ভাবনা কাটাবার বড়ি।

আমার কথাটা শেষ না হতেই উর্তাদো আবার কাতরে উঠল,—তোমার ওটা যাদুর টুপি বুঝলাম। সব ও থেকে তুমি বার করতে পারো, কিন্তু ওষুধের বড়িতে কি সত্যিকার ভয় কাটবে? চারিদিকে একবার চেয়ে দেখো। সমুদ্র ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, কিন্তু তেকোনা ফলার মত হাঙরের ডানাগুলো দেখতে পাচ্ছ? জল কেটে আমাদের দিকেই পাক দিতে দিতে ক্রমশঃ এগোচ্ছে।

উর্তাদো ভুল কিছু বলেনি। ডানা দেখেই বোঝা যায় সত্যিই দুটো বাঘ-হাঙর তখন আমাদেরই তাক করে কাছাকাছি চক্কর দিচ্ছে।

কিন্তু হাঙরের ডানা শুধু নয়, আরো কিছু আমি তখন দেখেছি। উর্তাদোকে সেই কথাই জানালাম। বললাম,—তোমার ভয় নেই উর্তাদো। ভেলা উল্টে তুফানের সমুদ্র থেকে বেঁচেছ, এ বিপদ থেকেও বাঁচবে। হাঙরেরা অন্ততঃ তোমায় আমায় ছুঁতেও পারবে না।

ছুঁতেও পারবে না?—উর্তাদো ভয়ে হতাশায় খিঁচিয়ে উঠল আমাকে,—হাঙর দুটো আমাদের পাক দিতে দিতে কত কাছে এসে পড়েছে দেখেছ?

দেখেছি!—তাকে সাহস দিয়ে বললাম,—সেই সঙ্গে সমুদ্রের শুশুক ওই পরপয়সগুলোকে দেখেছ কি! সমুদ্রের ওই সেপাইরা যখন এসে পড়েছে তখন আর ভাবনা নেই। সমুদ্রের প্রাণী হয়ে মানুষের ওপর কেন যে ওদের এত দরদ সেটা একটা রহস্য, কিন্তু ওরা কাছে থাকলে কোন হাঙরের সাধ্যও হবে না আমদের ছুঁতে।

যা বলেছি বেদবাক্যের মত চোখের সামনে তা ফলতে দেখা গেল এবার। কোথা থেকে একটা শুশুক এসে গুঁতো দিলে একটা হাঙরের পেটে। তার পরেই আরেকটা। অন্য হাঙরটারও শুশুকদের গুঁতোয় সেই দুরবস্থা। একটা দুটো নয় এক পাল পরপয়স তখন এসে হাঙর তাড়াবার দায় নিয়েছে। দেখতে দেখতে নাস্তানাবুদ হয়ে হাঙর দুটো

চম্পট দিলে। শুশুকের পাল আমাদের সঙ্গেই রইল যেন পাহারা দিতে।

মাথামোটা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূবের প্রায় সবটা জুড়ে ব্রেজিল। ব্রেজিলের উত্তর পূবে আটলান্টিক সাগর। সাধারণ মানচিত্রে দেখলে সে সমুদ্রে আফ্রিকার কূলপর্যন্ত নেহাৎ গোনাগুনতি কটা দ্বীপের ফুটকি ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না। ম্যাপে দাগ ফেলবার যোগ্য না হলেও ছোট-খাট দ্বীপও সমুদ্রে কিছু আছে। ব্রেজিলেরই একটি নেহাৎ নগণ্য বন্দর কাবেদেলা থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরের অমনি একটি অতি ছোট দ্বীপের সেদিন যেন কপাল ফিরে গেছে।

সাধারণতঃ যে দ্বীপে বছরের পর বছর ছাগল ভেড়া আর তাদের কজন রাখাল ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না সে দ্বীপের মাঝখানে সেদিন সরকারী তাঁবু পড়েছে। সিয়ারার জেলা সদর থেকে বহু অফিসার এসেছে নিলাম ডাকতে। সাত বছর বাদে বাদে এ সব দ্বীপ আগের মালিক এসে আবার না চাইলে নিলাম ডেকে ইজারা দেওয়া হয়।

সেই নিলাম ডাকার দিন সকালেই আমি ঘুরতে ঘুরতে ভুল করেই যেন সরকারী তাঁবুর সামনে এসে পড়েছি।

প্রথমেই সেখানে দেখা হয়েছে উর্তাদোরই এক জ্ঞাতিভাই দে দিয়সের সঙ্গে।

দে দিয়স আমায় দেখে হয়ত অবাক। কিন্তু বাইরে তা বুঝতে দিলে না বরং টিটকিরি দিয়ে বললে,—কি দাস, তোমায় একলা দেখছি যে? লেজুড়টি মানে আমার ভাই উর্তাদোকে কোথায় রেখে এলে?

যেখানে রাখলে সুবিধে হয় সেখানে!—যেন নিজের রসিকতায় এক গাল হেসে বললাম,—এ সব কাজে সঙ্গী না রাখাই ভালো নয় কি? তুমিও ত একলা এসেছ দেখছি।

তা না এসে কি করি বলো ?—দে দিয়স আগের সুরটা পাল্টে যেন আন্তরিকতার সঙ্গে বললে,—হাজার হলেও আমাদের পরিবারের সম্পত্তি ত ছিল। উর্তাদোর যখন গরজ নেই তখন আমাকেই ডেকে নিতে হয়।

তোমার এ দ্বীপটার ওপর লোভ কিন্তু আগেও যেন ছিল দিয়স !—সন্দেহটা মুখে ফুটতে দিয়েই বললাম,— উর্তাদো একবার আমায় বলেছিল মনে হচ্ছে।

বলেছিল !—দে দিয়সের চোখদুটো যেন ছুরির ফলা হয়ে উঠল,—তা লোভ থাকলে হয়েছেটা কি ? লোভ আছে বলেই ত ডেকে নেব আজ !

ও ! তাই তুমি এখানে ! আমি যেন অনেক দেরীতে বুঝে আমার ভুলটা স্বীকার করলাম—আমি ভেবেছিলাম তোমার ভায়ের হয়েই বুঝি আবার দ্বীপটার ইজারা চেয়ে নিতে এসেছ !

একটু থেমে তারপর বললাম,—কিন্তু ধরো উর্তাদো যদি নিলামের ডাকের আগে এসে পড়ে ?

এসে পড়বে উর্তাদো !—দে দিয়স একেবারে খোলাখুলিই মুখ বাঁকিয়ে বললে,—এলে তার ভূতটাই আসবে, তাকে জ্যান্ত আর আসতে হবে না।

হ্যাঁ, আসা শক্ত বটে !—আমি মুখটা হতাশ করে স্বীকার করলাম,—দ্বীপটার চারিধারে তোমার দু দুটো মেশিনগান বসানো লঞ্চ পাহারা দিয়ে ঘুরছে দেখে এলাম বটে। এ দ্বীপে যে বোট আসবে গুলিতে ঝাঁঝরা করে ডুবিয়ে দেবে।

আমার কথা শুনতে শুনতে দে দিয়সের চোখদুটো হঠাৎ ছোট হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে মুখটাও ছোটলোকের মত। আমাকে যেন চোখের সড়কিতে ফুটো করার চেষ্টায় বললে,—তুই ! তুই কি করে এলি এখানে ?

ভূত হয়ে ছাড়া আর কি করে আসব বলো !—তার দিকে চেয়ে

একটু ভুতুড়ে হাসি হাসলাম।

ভূতই তোকে বানিয়ে ছাড়ব !—আমার গলাটা এক হাতে টিপে ধরে বিড়ালছানার মত শূন্যে ঝুলিয়ে ধরে দে দিয়স বললে,—সত্যি করে বল্ কেমন করে এসেছিস।

বলব কেন শুধু !—ঝোলানো অবস্থাতেই মাথার শনগাদেইরো টুপিটা খুলে তা থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে দে দিয়সের হাতে দিয়ে বললাম,—সব ত লিখে এনেছি। তুমি চোরাচালানের একটা বড় ঘাঁটি বানাবার জন্যে এ দ্বীপটার ইজারা চাও, আর উর্তাদো চায় পশুপালনের একটা গবেষণা-কেন্দ্র বসাতে। তার উদ্দেশ্যটাই ভালো মনে হল বলে তাকে সঙ্গে করে আনলাম।

তুই নিজে শুধু আসিসনি, উর্তাদোকেও সঙ্গে করে এনেছিস ?—দে দিয়স রাগে আমার গলাটা যেন নিংড়োবার মত করে প্রাণপণে চেপে ধরল।

কাতুকুতু লাগছে। ছাড়ো !—বলে এবার তার হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে মাটিতে নেমে বললাম,—তোমার যা এখন অবস্থা ও কাগজের লেখা মগজেই ঢুকবে না। কিসে কেমন করে উর্তাদোকে নিয়ে এলাম চলো দেখিয়ে দিই।

চুলের মুঠিটা একটু আলতো করে ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তাই দেখালাম। দেখাতে দেখাতে বুঝিয়েও দিলাম সব। যা বোঝালাম তার মোদ্দা কথাটা হল এই—

শনগাদা নামে ওই ভেলা পোর্তুগিজরা কলম্বাসের পর প্রথম ব্রেজিলে এসে নামবার সময় দেখেছিল। মাঝারি একটা টেবিলের মাপের কটা হালকা গুঁড়ি-জোড়া-দেওয়া একটা ভেলায় বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মত অতি মিহি কাপড়ের ঢাউস পাল খাটিয়ে ওদেশের জেলেদের বারদরিয়ায় পাড়ি দেওয়ার সাহস দেখে তারা অবাক।

পুরুষানুক্রমে সে বিদ্যা আর সাহস এখনও এ অঞ্চলের জেলেদের

আছে। তারা এই যন্ত্রের যুগেও মাছ ধরার জন্যে ওই বিপজ্জনক ভেলাই পছন্দ করে।

উর্তাদোকে নিলামের ডাকের দিন তার দ্বীপে নামতেই না দিয়ে তার মালিকানা ফাঁকি দিয়ে নেবার একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে বুঝে মোটর লঞ্চ স্টীমারের বদলে ওই ভেলাই আমি বাহন হিসেবে ঠিক করি। ভেলায় আসার জন্যেই দে দিয়সের 'পাহারাদার বোট দুটো আমাদের হদিস পায় নি।

দে দিয়সের সব শয়তানী ফন্দিও ব্যর্থ হয়েছে তাইতে। যে তারিখে দ্বীপটার ইজারা আবার পেয়েছিল তারই মান রাখতে উৎসব করবার জন্যে উর্তাদোর টাকা পাঠানো। কম হোক বেশী হোক ভালবেসে যখন পাঠিয়েছে তখন খরচ করো প্রাণ খুলে!

ঘনাদা গোটা সিগারেটের টিনটা শিশিরের হাতেই তুলে দিলেন।

কিন্তু ওই আপনার হুয়ার্তো···শিবু যা বলতে যাচ্ছিল তা আর বলা হল না।

বানানে এইচ্ থাকলেও উচ্চারণটা হুর্তাদো নয় উর্তাদো!—বলে শিবুকে থামিয়ে ঘনাদা টিনটা ভুলেই যেন ফেলে উঠে পড়লেন।

তারপর ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে আর একবার পিছু ফিরে শেষ রাত্রের মারটি ছেড়ে গেলেন।

—ও,উর্তাদো নামটা আবার ব্রেজিলেরও নয় পেরুর। মিউনিখ অলিম্পিকের কুস্তি লড়নেওয়ালাদের তালিকা খুঁজলেই দেখতে পেতে।

ঘনাদা সামনে থাকলে আমরা অধোবদনই হতাম। তার বদলে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম একটু অপ্রস্তুতের মত হেসে।

কিন্তু অপ্রস্তুতই বা কেন? অত ফন্দি-ফিকির অত মুসাবিদা, শিশিরের ওই পঞ্চাশটা টাকা নেহাৎ ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে কি?

ঘনাদা এলেন !

হ্যাঁ ঘনাদা একদিন এসেছিলেন !

নিশ্চয়ই একদিন এসেছিলেন আমাদের এই বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনে।

কিন্তু কবে কখন কেমন করে তিনি প্রথম এলেন সে কথা মনে করতে গিয়ে বেশ মুশকিলে পড়তে হচ্ছে।

ঘনাদা নামে কোনো এক জনের সঙ্গে এই বাহাত্তর নম্বরে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি বলতে মনে যা আসছে তা স্রেফ একটি ব্যাগ।

হ্যাঁ, মাঝারি সাইজের ক্যাম্বিশের একটি ব্যাগ।

না, মানুষ জন কেউ নয় শুধু একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ—ছেঁড়াখোঁড়া পুরোন না হলেও বেশ একটু জীর্ণ গোছের।

বাহাত্তর নম্বরের প্রথম পত্তনের সময়ে, সব কিছু তখন তো এলোমেলো অগোছালো। সুবিধামত একটা বাড়ি পেয়ে যে ক'জনে মিলে সেখানে একটা শহুরে আস্তানা বানাবার ব্যবস্থা করেছিল, এখন বাহাত্তর নম্বর বলতে যাদের নামগুলো আপনা থেকেই মনে আসে সেই চারজনই তাদের মধ্যে তখন ছিল প্রধান।

অর্থাৎ বাহাত্তর নম্বর বলতে এখন যেমন তখনও সেই চার

মূর্তিমান—শিশির, শিবু, গৌর এবং আমি।

বাড়িটা পুরানো হলেও খুব ভাঙাচোরা নয়। সামান্য একটু আধটু মেরামতের পর চুনকাম করিয়ে আমরা তার কয়েকটা ঘরে তখনই বিছানাপত্র পেতে ঢুকে পড়েছি। এখন যেটা আমাদের আড্ডাঘর সেইটেই তখন কিছু-জমা-করা আসবাবপত্র নিয়ে খালি পড়ে আছে। ঠিক করা আছে যে দুদিন বাদে একটু হাতখালি হলেই আসবাবপত্র গুছিয়ে সেটাকে বসবার ঘর বানানো হবে। সকালে বিকালে ওদিকে যেতে আসতে এরি মধ্যে সেখানে একদিন ঘরের মাঝে জমা করা আসবাবপত্রের মধ্যে একটা গোলটেবিলের ওপর ক্যাম্বিশের ব্যাগটা চোখে পড়েছে।

একদিন দুদিন বাদেও টেবিলের ওপর ক্যাম্বিশের ব্যাগটা সমানে বসানো আছে দেখে ব্যাগটা কার তার সন্ধান নিতে হয়েছে।

ব্যাগটার বর্ণনা আগেই করেছি। ওরকম ব্যাগ আমাদের কারুর যে নয় তা বুঝেই সেটার উপস্থিতি একটু অবাক করেছে।

পরস্পরকে জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা করেও রহস্যটার খুব স্পষ্ট একটা মীমাংসা কিন্তু পাওয়া যায় নি। শিবুই একটু ভেবে ভেবে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছে—হ্যাঁ, ওই একজন, মানে আমাদের চেনা কেউ নন, মানে বিপদে পড়ে···

বিপদে পড়ে কি ? গৌর শিবুকে তার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ঝাঁঝালো গলায় জেরা করেছে,—বিপদে পড়ে তিনি এখানে আমাদের সঙ্গে বাসা বাঁধবেন নাকি ?

না, না, তা নয়!—শিবু তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে জানিয়েছে,—বরাবরের জন্য না, মাত্র কদিনের জন্য বাধ্য হয়ে এখানে আছেন। খুব কি একটা দরকারী ব্যাপারে কার জন্যে যেন···

হয়েছে! হয়েছে!—শিশির শিবুকে একরকম ধমক দিয়েই থামিয়ে দিয়ে বলেছে, কে, কি, কেন, কিছুই না জেনে কোনো একজনকে ঢুকিয়ে দিয়েছ আমাদের এখানে! এখন তিনি তাঁর এই

ব্যাগ নিয়ে···

না, না, কোনো অসুবিধে আপনাদের করব না। শিশিরের কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে বারান্দার দরজা দিয়ে যিনি এবার ঘরে ঢুকেছেন তাঁর চেহারার বর্ণনা দেবার বোধহয় দরকার নেই। হ্যাঁ, সেই শুকনো পাকানো ত্রিশ থেকে ষাট যে কোনো বয়সের ধারালো কুড়ুল মার্কা মাঝারি মাপের চেহারা। গলাটি শুধু চেহারার তুলনায় রীতিমত ভারিক্কি।

ঘরের ভেতর ঢুকে এসে দু-হাত তুলে সকলকে নীরব নমস্কার জানিয়ে ভদ্রলোক বলেছেন, মাত্র দুদিনের ব্যাপার। আপনাদের তেতলায় ন্যাড়া ছাদে একটা ঘর দেখে এলাম—

তেতলায় ন্যাড়া ছাদের ঘর?—আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠে বলেছি,—সেটা আবার ঘর কোথায়? যতসব ফালতু ভাঙাচোরা আসবাবপত্র ভরা চোর-কুঠুরি বললেই হয়।

তা হোক—ভদ্রলোক আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন—ওখানে একটা ভাঙা তক্তাপোষ রয়েছে দেখলাম। ঘরটা একটু পরিষ্কার করে আমার ব্যাগটা নিয়ে দুদিন বেশ কাটিয়ে দিতে পারব। ব্যাগটা তাই এখন নিতে এসেছি।

ঘরের টুকিটাকি দু চারটে জিনিস রাখা বড় গোলটেবিলটার ওপর থেকে তাঁর ক্যাম্বিশের ব্যাগটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোক চলে যাবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে যেন আমাদের আশ্বস্ত করবার জন্যেই বলেছেন—ওই জার-বোয়া জবাবের জন্যেই ত অপেক্ষা। তা হয়ত অন্তত কালই পেয়ে যাবো—পাওয়া ত উচিত।

কি বললেন? কিসের জবাব?—আমাদের সকলের প্রশ্নটা গৌরের মুখেই এবার শোনা গেছে।

জবাবটা জার-বোয়া ছাপের। মানে জার-বোয়া ছাপের ইশারার,—ভদ্রলোক যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু বিশদ হয়েছেন—কাগজে ও ছাপ দেখেই আমি তা আর কোনও ভুল করি

নি। যেমন কথা ছিল তেমনি যেখানে ও ছাপ দেখেছি সেখানেই তখুনি যেমন জুটেছে তেমনি আস্তানা যোগাড় করে যথাস্থানে ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছি। এখন শুধু জবাবটা আসার অপেক্ষা। জার-বোয়ার ছাপ, কাগজে যে ছাপিয়েছে, গরজটা নিশ্চয়ই তার এমন যে জবাব দিতে এক লহমা সে দেরী করবে না। চাই কি আপনাদের এই বনমালী নস্কর লেনে স্বয়ং সেই বব কেনেথই...

ওই পর্যন্ত বলেই ভদ্রলোক হঠাৎ থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে, না, না, এসব কি বলছি। মাপ করবেন আপনারা, বলে তাঁর ব্যাগটা নিয়ে বারান্দার দরজার দিকে এগিয়েছেন।

কিন্তু দু পা-র বেশী বাড়াতে তিনি পারেন নি। আমাদের সকলের হয়ে শিশিরই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে বাধা দিয়ে বলেছে,—আহা, যাবার জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আপনার সেই চার পোয়া ছাপ যে ছেপেছে...

চারপোয়া নয় জার-বোয়া ! শিশিরকে বেশ একটু করুণার সঙ্গেই সংশোধন করে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছেন,—জার-বোয়া কি তা ত নিশ্চয় জানেন ?

না।—অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে নিজেদের মূর্খতা স্বীকার করে বলেছি, জার-বোয়া বল্লম টল্লমের মত কোনো অস্ত্রশস্ত্র না কোনো রকম বাদশাহী পোশাক টোশাক ?

না, সে সব কিছু নয়—অনুকম্পা ভরে ভদ্রলোক জানিয়েছেন, জার-বোয়া হল সাহারার মরু অঞ্চলের এক রকম ইঁদুর। ইঁদুরের বদলে...

ভদ্রলোক এই পর্যন্ত বলতেই শিশির, শিবু দুজনেই এক সঙ্গে উঠে পড়ে তাঁর হাত থেকে ক্যাম্বিশের ব্যাগটা টেনে নিয়ে তাঁকে ধরে একটা খালি চেয়ারে বসাতে বসাতে বলেছে—আহা, আপনি যাবার জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আপনার সেই জারুবোয়া ছাপের মক্কেল ত আর দোতলা বাদ দিয়ে আপনার তেতলায় পৌঁছোতে



পারবে না। আপনি এখানেই বসুন না। তারপর ওই মরু অঞ্চলের ইঁদুর জার-বোয়া নিয়ে কি যেন বলছিলেন?

ওই জার-বোয়া নিয়ে?—ভদ্রলোক বেশ যেন একটু অনিচ্ছার সঙ্গে একটা চেয়ারে বসে বলেছেন, হ্যাঁ বলছিলাম যে ইঁদুরের বদলে ওকে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির ক্ষুদে ক্যাঙ্গারু বললেই যেন ঠিক হয়। ক্যাঙ্গারুদের মত সামনের পা দুটি ক্ষুদে ক্ষুদে আর পেছনের পাগুলো সামনের চেয়ে প্রায় ছ গুণ লম্বা। ইঁদুরগুলো তাই তাদের আকারের তুলনায় ক্যাঙ্গারুদের চেয়ে লম্বা লাফ দিতে পারে।

তা পারে ত পারে!—আমিই প্রথম একটু ঠাট্টার সুর লাগিয়ে বলেছি—উত্তর আফ্রিকার এক ক্যাঙ্গারু-মার্কা ইঁদুরের এত কি খাতির যে তার ছবি কোথাও ছাপা দেখলেই একপায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে, আর ওই ক্যাঙ্গারু ইঁদুরের ছবি ছাপাও বা হয়েছে কোথায়? এখানকার কোনো কাগজে ত দেখিনি।

এখানকার কোনো কাগজে দেখেন নি।—ভদ্রলোকের গলায় এবার যেন অবোধের প্রতি অনুকম্পা—তা দেখবেন কি করে? এখানকার কোনো কাগজে ত নেই, ও ছাপ বেরিয়েছে খাস লণ্ডন টাইম্‌সে।

লণ্ডন টাইমসে বেরিয়েছে আর আপনি... ?

আমার কথাটা আর শেষ করতে হয় নি। ভদ্রলোক নিজেই বাক্যটা সম্পূর্ণ করে বলেছেন—আর আমি এখানকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে সেটা দেখে এসেছি। যেখানে যখন যাই আর থাকি ওই লণ্ডন টাইমস্‌টার ওপর আগাগোড়া চোখ বোলানো আমার সাত বছরের নিত্য কর্ম।

সাত বছর!—আমাদের সকলের হয়ে গৌর দু চোখ প্রায় কপালে তুলে বলেছে—আপনি সাত বছর ধরে লণ্ডন টাইমস্‌-এর ওপর চোখ বুলিয়ে আসছেন?

হ্যাঁ প্রায়—সাত বছরই ত হল।—ভদ্রলোক একটু যেন দুঃখের

সঙ্গে জানিয়েছেন।

কিন্তু কেন? সাত বছর ধরে রোজ রোজ নিয়ম করে একটা বিশেষ বিদেশী কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে যাওয়া সোজা কথা নয়। তার একটা কারণ আছে।—শিশির আমাদের সকলের মনের কথাটাই প্রকাশ করেছে।

তা কারণ আছে বইকি। নিশ্চয় একটা কারণ আছে?—ভদ্রলোক এখনো যেন কথাটা খোলসা করে বলতে চান না।

কিন্তু আমরা ছাড়বার পাত্র নয়। সোজাসুজি তাঁকে চেপে ধরেছি—তা সেই কারণটা একটু খুলে বলুন না!

খুলে বলব?—ভদ্রলোক এখনো যেন দ্বিধা করে তারপর বলেছেন,—তাহলে যেতে হবে কিন্তু উগাণ্ডায়!

উগাণ্ডায়?—আমরা বিমূঢ়। গৌরই প্রথম নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করেছে—উগাণ্ডা মানে আফ্রিকার উগাণ্ডায়?

হ্যাঁ, সেখানকার রিজার্ভড ফরেস্ট মানে অভয়ারণ্যে।—ভদ্রলোক যেন বাধ্য হয়ে জানিয়েছেন।

কিন্তু সেখানে এখন যাবো কি করে?—জিজ্ঞাসা করে আর যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হয় নি।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমাদের ভুল শুধরে দিয়ে বলেছেন,—না না, এখন নয়, যাবার কথা বলছিলাম সাত সাড়ে সাত বছর আগেকার উগাণ্ডার সংরক্ষিত অরণ্যে। মানে সমস্ত ব্যাপারটা সেখানেই শুরু কিনা। শুরু টাইকুন ট্যানার-এর সেই আফ্রিকা-চমকানো শাহানশাহী-সফরী-তে!

একটু থেমে আমাদের অবস্থাটা অনুমান করেই বোধহয় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি নিজের কথার ব্যাখ্যায় বিশদ হয়ে বললেন,—সফরী মানে যে কি তা নিশ্চয় আপনারা জানেন, তবে টাইকুন ট্যানার-এর সফরীর সঙ্গে এখনকার গোনাগুনতি খরচে ভাড়া-করা সফরীর আকাশ-পাতাল তফাৎ।—জঙ্গলে বারশিঙা শিকার আর বাজার

থেকে কাটা পাঁঠার মাংস কেনার চেয়ে অনেক বেশী। টাইকুন ট্যানারের সফরী মানে একটা রাজসূয় ব্যাপার। বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যত খুশি যে কোনো প্রাণীশিকার আইন করে তখন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু নামের আগে সিংহের ঘাড়ের কেশরের মত টাইকুন শব্দটা যার জোড়া হয়ে গেছে, কোটিপতি ধনকুবেরদেরও যে শাহানশাহ, টেক্সাস-এর সেই জীবন্ত ট্যাঁকশাল টাইকুন ট্যানার কি আইনের পরোয়া করে! সফরী-তে গোনাগুনতি শিকার করবার সরকারী পারমিট মানে হুকুমনামা সে ত উগাণ্ডার অরণ্য-দপ্তরের বড়কর্তার কাছ থেকে নিজে নিয়ে নিয়েছে। টাইকুন ট্যানারের নাম জানতে কারুর বাকি নেই। সে টাইকুন ট্যানার নিজে সশরীরে অফিসে এসেছে। বন-বিভাগের বড়কর্তা তাকে খাতির করে কোথায় বসাবেন ভেবে পান নি। টাইকুন ট্যানার-এর চেহারাটা তার ঐশ্বর্যের মাপে এমন দশাসই যে একটা প্রমাণ মাপের কোচ-এ তাঁকে আঁটানো যায় না। টাইকুন ট্যানার অবশ্য কোথাও বসার বদলে আগাগোড়া দাঁড়িয়েই বন-বিভাগের বড়কর্তার সঙ্গে তাঁর কথা সেরেছেন। শিকারের পারমিটটা সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি পড়ে দেখেছেন যে অন্যসব সাধারণ জানোয়ারের বেলা তেমন কড়াকড়ি না থাকলেও হাতী গণ্ডার সিংহের মত বড় বড় জানোয়ারের বেলা শিকারের অনুমতি দারুণ কড়া। এ হুকুমনামা পড়েও অন্য অনেকের মত বিন্দুমাত্র অনুযোগ আপত্তি না জানিয়ে টাইকুন ট্যানার যেন খুশি মনে বন-বিভাগের বড়কর্তার সঙ্গে করমর্দন করে চলে আসবার সময় শুধু জিজ্ঞাসা করেছে,—শিকার যতই গোনাগুনতি করে রাখা হোক, সফরীর লোকলস্কর লটবহরের বেলা সেরকম কোনো বিধিনিষেধ নেই?

না, তা নেই।—বন-বিভাগের বড়কর্তা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু অতবড় বিরাট বাহিনী আপনি সঙ্গে নিচ্ছেনই বা কেন? ওর অনেক ঝামেলা।

ওই ঝামেলা পোহানোতেই আমার সুখ।—বলেছে টাইকুন ট্যানার,—তাছাড়া বিরাট আর কোথায় দেখলেন। শিকারী আমার একজন ওই বব কেনেথ!

হ্যাঁ, ও-ত একাই একশ। হেসে বলেছেন অফিসার। ওর চেয়ে বড় শিকারী এখন সারা আফ্রিকায় আর কেউ আছে বলে জানি না।

হ্যাঁ, তাই শুনেছি বলেই ওকে নেওয়া, দেখা যাক যত হাঁক ডাক তত এলেম সত্যি আছে কি না!—হেসে বলেছে টাইকুন ট্যানার।

এর ওপর আপনি শিকারের বন্দুকও গণ্ডা গণ্ডা নিয়েছেন দেখলাম আমাদের অফিসে পাঠানো আপনার লটবহরের তালিকা থেকে। অত বন্দুক আপনার মিছিমিছি বওয়াই সার। কি কাজে লাগবে আপনার অত বন্দুক?—হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করেছেন বন বিভাগের ওপরওয়ালা অফিসার।

মনে করুন ও শুধু নিজের অহঙ্কারকে একটু তোয়াজ—বলেছে টাইকুন ট্যানার,—ওগুলো যে সঙ্গে আছে তাই দেখার সুখ। আর শুধু, এখন দুনিয়ার সেরা যা শিকারের বন্দুক আছে তা সব ত ওর মধ্যে আছেই, সেই সঙ্গে সেরা একজন বন্দুকের ডাক্তারকেও সঙ্গে নিয়েছি।

বন্দুকের ডাক্তার? রীতিমত অবাকই হয়েছেন বন-বিভাগের বড়কর্তা—সে আবার কি?

কি তা বুঝলেন না!—টাইকুন ট্যানার বলেছে—ডাক্তার মানে হালের বন্দুকের কারিগরির সেরা মিস্ত্রী। ম্যাচলককে যে রাইফেলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াতে পারে।

তা ভালো! তা ভালো!—মনে মনে এই দাম্ভিক টাকার কুমীরটার ওপর যতই খাপ্পা হয়ে উঠুন মুখে হাসি টেনে বন-বিভাগের বড়কর্তা বলেছেন, আইনকানুন সব মেনে আপনার এত সাধের সফরী

সার্থক হয়ে ফিরে আসুক এই শুভকামনাই জানাই।

ও, আপনাদের আইন-এর কথা বলছেন ? কিচ্ছু ভাববেন না, ফিরে আসার পর তার গায়ে আঁচড়ও দেখতে পাবেন না। এ শুভকামনার জন্যে ধন্যবাদ বলে টাইকুন ট্যানার বন-বিভাগের বড়কর্তার এমন করমর্দন করে দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে যে জখম হাত নিয়ে বনের বড়কর্তাকে ককিয়ে ওঠা চাপতে হয়েছে অনেক কষ্টে।

টাইকুন ট্যানারের যাদের নিয়ে অত হম্বিতম্বি তার সফরীতে গোল বাধল কিন্তু তাদের নিয়েই—সেই কে না কে বন্দুকের ডাক্তার আর আফ্রিকার সেরা শিকারী বব কেনেথ।

টাইকুন ট্যানারের সফরী তখন জানা-অজানা অনেক বন জঙ্গল পার হয়ে এক নতুন জায়গায় আস্তানা গেড়েছে। এ পর্যন্ত যা শিকার হয়েছে তা সাধারণ তিনটে দলের সফরীর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ট্যানারের তাতে মন ভরে নি। এ সফরী থেকে সে এমন কিছু মেরে নিয়ে যেতে চায় দুনিয়ার শিকারী মহলের চোখ যাতে ছানাবড়া হয়ে যাবে।

এই নতুন আস্তানায় সেই ভাগ্যই যেন তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আস্তানা পাতবার পরের দিনই সকালে নিজের বাদশাহী তাঁবু থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি জঙ্গলটা একটু ঘুরে আসতে গিয়ে সে এক জায়গায় এসে দাঁড়াবার পরই আতঙ্কে যেমন কেঁপে উঠল তেমনি হয়ে গেল মোহিত।

ভদ্রলোক এই মোক্ষম জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গিয়ে নিজের গায়ের কোটটার দুদিকের পকেট দুটো দুবার চাপড়ে মুখটায় কেমন যেন বিরক্তি ফুটিয়ে চুপ করে গেলেন।

কি হল কি তাঁর হঠাৎ, ভেবে যখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছি শিশির তখন ব্যাপারটা ঠিক বুঝে ফেলে তার হাতের টিন থেকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললে, সিগারেট খুঁজছেন এই নিন

না।

নেব ?—ভদ্রলোক যেভাবে শিশিরের দিকে চেয়ে যে গলায় 'নেব' বললেন, তাতে প্রথমে মনে হল বুঝি শিশিরের তাঁকে সিগারেট দিতে চাওয়াটা অপমান জ্ঞান করে তিনি আসর ছেড়ে চলেই যাবেন উঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হল ভদ্রতার খাতিরেই শিশিরের স্পর্ধা সহ্য করে তিনি নরম হয়ে শিশিরের বাড়িয়ে দেওয়া টিনের উঁচিয়ে থাকা সিগারেটটা তুলে নিয়ে নিজের ওপরই বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন,—হ্যাঁ, প্যাকেটটা কোথায় যে ফেলে এসেছি কে জানে ? হ্যাঁ একটা কথা কিন্তু বলে রাখছি, কিছু মনে করবেন না। সিগারেট আমি কারুর কাছে দান নিই না। সুতরাং এ সিগারেট আপনার কাছে ধার হিসেবেই নিলাম। মনে রাখবেন আপনার কাছে একটি সিগারেট ধার রইল।

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই মনে রাখব। বলে শিশির তখন তাঁর সিগারেটটার জন্য তার লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরেছে।

সে লাইটারের আগুনে সিগারেটটা ধরিয়ে তাতে দুটো রাম-টান দেবার পর প্রায় এক জালা ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক বলেছেন, কি যেন বলছিলাম ? হ্যাঁ, ওই টাইকুন ট্যানারের আতঙ্ক আর উল্লাসের কথা।

ঠিক ! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে টাইকুন ট্যানার তখন খুশিতে ডগমগ।

এইত ! টাইকুন ট্যানারের প্রাসাদের সিংদরজার মান বাড়াবার জন্যে এইটিরই দরকার ছিল। কম বেশী প্রায় আশী কিলো ওজনের গজদন্ত নিয়ে কিছুদূরে স্বয়ং হাতীদের সম্রাট ঐরাবতই যেন তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বনভ্রমণে বেরিয়েছে।

ট্যানার-এর হাতে বন্দুক ছিল না। আর থাকলেই বা সে করত কি ? একবার তার দিকে ফিরে তাকে দেখতে পেলে গজরাজ কি করতে পারেন তাই ভেবে কাঁপতে কাঁপতে ট্যানার-এর গায়ে তখন যেমন ঘাম ছুটছে তেমনি আবার আশায় বুকও দুলছে যদি কোনমতে

হাতীর পাল তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যায় আর যদি তারপর কোনমতে তাঁবুতে ফিরে সে দরকার মত সকলকে ডাক দিয়ে এই হাতীর পালের পিছু নিয়ে কেনেথকে দিয়ে আসল গজরাজকেই শিকার করাতে পারে।

ট্যানারের ভাগ্য তখন ভালো। হাতীর পাল নিয়ে গজরাজ নিজের খেয়ালে অন্য দিকে চলে যেতেই সে নিজের তাঁবুতে এসে সবার আগে বব কেনেথ আর সমস্ত বন্দুক পিস্তলের খোদ খবরদারীর ভার যার ওপর সেই বড় মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানালে। ভাগ্যের জোরে আপনা থেকে যা তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে তার দেখা গজরাজের সেই দাঁতাল মুণ্ডটা যে তার চাই-ই সক্কলকে সে জোর দিয়ে জানিয়েছে।

কিন্তু কই! এত বড় একটা খবরে কারুর কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন? তার সামনে দুই মূর্তি যেন জড়ভরত হয়ে দাঁড়িয়ে।

কি? কি হল কি তোমাদের? টাইকুন ট্যানার এবার গর্জে উঠল,—সব কালা বোবা হয়ে গেছ নাকি?

মানে?—আমতা আমতা করে এবার মুখ খুলল বব কেনেথ—বড় শিকার আর আমরা কি করতে পারি? আমাদের····

আমাদের?—ধমক দিয়ে কেনেথকে থামিয়ে দিয়ে টাইকুন ট্যানার আবার গর্জন করে উঠল, কি হয়েছে আমাদের? হাত ঠুঁটো হয়ে গেছে, না বন্দুকের সব বারুদ ভিজে গেছে? শিকার করতে পারব না কেন?

পারব না।—বন্দুকের বড় মিস্ত্রী বেশ ঠাণ্ডা গলায় বললে—আমাদের পারমিটে আর বড় শিকারের অনুমতি নেই বলে। হুকুমনামায় যে কটা বড় শিকার আমাদের মারবার অনুমতি দেওয়া ছিল সব কটাই আমরা মেরেছি। দু একটা ছোট শিকারের বন্দুক ছাড়া সব বন্দুক আমি তাই বাক্সবন্দী করে দিয়েছি।

কি করেছ চিমসে চামচিকে? বলে ঘাড় ধরে বন্দুকের মিস্ত্রীকে

শূন্যে তুলে টাইকুন ট্যানার বললে, বড় বন্দুক সব বাক্সবন্দী করে দিয়েছ ?

হ্যাঁ—ট্যানারের হাতে ঘাড়-টিপে-ধরা অবস্থাতেই বন্দুকের মিস্ত্রী যেন সুখবর দেবার মত গলায় বললে, শুধু বাক্সবন্দীই করি নি। তার আগে বন্দুকগুলোর কলকব্জা খুলেও দিয়েছি।

কলকব্জা খুলে দিয়েছিস ! চিড়বিড়িয়ে উঠে টাইকুন ট্যানার বন্দুকের মিস্ত্রীকে আছড়ে মারবার মত করে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বললে,—তোকে আমি জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে মারব।

একটা ডিগবাজি খেয়ে বন্দুকের চিমসে মিস্ত্রী তখন কিছুদূরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবুঝকে বোঝাবার মত গলায় সে বললে,—আমায় পুঁতে ফেলতে চান ? তা অবশ্য আপনি পারেন। কিন্তু তাহলে আপনার ওই অত সাধের বন্দুকগুলোর মায়া যে ছাড়তে হবে। ওগুলোর কলকব্জা এখন খোলা। সেসব আবার জোড়া লাগাবার বিদ্যে অমন দু পাঁচ হাজার মাইলের মধ্যে সারা উগাণ্ডায় আর কারুর নেই। আমি মাটির নিচে পোঁতা থাকলে ওসব বন্দুকের প্যাঁচ জানা মিস্ত্রীর খোঁজে কাকে কোথায় পাঠাবেন ? যাকে পাঠাবেন সে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছোবে কি ! পৌঁছোলেও কতদিনে সে ওস্তাদ মিস্ত্রী নিয়ে এখানে ফিরবে ? আর যতদিনে ফিরবে ততদিন আপনি এখানে টিকে থাকতে পারবেন কি ?

বন্দুকের মিস্ত্রী যতক্ষণ তার কথা শোনাচ্ছিল ততক্ষণ টাইকুন ট্যানারের মুখটা ছিল যেন বজ্র-বিদ্যুৎ ঝড়বৃষ্টির ছবি ফোটানো ছায়াছবির পর্দার মত। এই মনে হচ্ছিল রাগে দাঁত কিড়মিড়িয়ে হিংস্র হায়নার মত সে ঝাঁপিয়ে পড়বে বন্দুকের মিস্ত্রীর ওপর আবার মিস্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে নিজের অবস্থাটা বুঝে সে দমকা ঝড় হঠাৎ থেমে যাওয়ার মত সামলাবার চেষ্টা করছিল নিজেকে। শেষ পর্যন্ত তার প্যাঁচালো বুদ্ধিরই জয় হয়েছে।

বেয়াড়া গরম মেজাজের জন্যে নিজেই যেন নিজের কান মলে

ট্যানার এবার যা বলেছে তার মর্ম হল এই যে বন্দুকের মিস্ত্রীর ওপর রাগারাগি করা তার অন্যায় হয়েছে। মিস্ত্রীর সঙ্গে সে মিটমাটই চায়। মিস্ত্রী যদি তার সব বন্দুকের কলকব্জা ঠিক করে সেগুলো চালু করে দেয় তাহলে সে, যা তার পাওনা তার ওপর মোটা বকশিশ দিয়ে তাকে ছুটি দিয়ে যাবে।

বন্দুকের মিস্ত্রী একটু ভেবে নিয়ে প্রস্তাবটায় রাজী হয়েছে। আর ঘণ্টাখানেক বাদে বাক্সবন্দী সব বন্দুক খুলে চালু করে দিয়ে তার পাওনা আর বকশিশ চেয়েছে।

বন্দুকগুলো সব হাতে পাওয়ার পর নিজমূর্তি ধরেছে ট্যানার। পাওনা আর বকশিশ চাও?—সে যেন কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বলেছে, দুই-ই পাবে এখনি।

পাওনাটা সে তখনই মিটিয়ে দিয়েছে, তার নিজের কজন দৈত্যাকার কাফ্রী সেপাই দিয়ে বন্দুকের মিস্ত্রীকে ধরে বেঁধে শিকার-করা জানোয়ারদের ছাড়ানো চামড়া জমা-করা একটা তাঁবুতে বন্দী করে ফেলে রেখে। আর ফেলে চলে যাবার সময় আশা দিয়ে গেছে যে বকশিশটা দিয়ে যাবে দাঁতালো গজরাজকে মেরে তার গজদন্ত নিয়ে এখানকার আস্তানা তুলে চলে যাবার সময়ে হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই এই জঙ্গলে ফেলে রেখে দিয়ে।

বন্দুকের মিস্ত্রীকে হাত পা বেঁধে বন্দী করে চলে যাবার পর টাইকুন ট্যানার নিজেই কিন্তু পড়েছে মহা মুস্কিলে। হাতী মারবার চালু বন্দুক ত সে হাতে পেয়েছে, কিন্তু সে বন্দুক ছুঁড়বে কে? বন্দুক উদ্ধারের পর খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে শিকারী বব কেনেথকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজাখুঁজির মধ্যে তার তাঁবুতে তার লেখা একটা চিরকুট পাওয়া গেছে। বব কেনেথ তাতে লিখে গেছে যে হুকুমনামায় যা লেখা আছে তা অগ্রাহ্য করে বাড়তি দাঁতালো হাতী নয়ই অন্য কোন কিছু শিকার করে সে সারা আফ্রিকায় অচ্ছুৎ শিকারী হিসেবে দাগী হয়ে নিজের সব রুজি-রোজগার আর ভবিষ্যৎ নষ্ট

করতে পারবে না। সেই জন্যেই টাইকুন ট্যানারের জবরদস্তি এড়াতে নিজের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা না নিয়েই তাকে পালাতে হচ্ছে।

পালাতে হচ্ছে, কিন্তু পালিয়ে যাবি কোথায় ?—কেনেথের লেখা চিরকুট পড়তে পড়তে রাগে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলেছে টাইকুন ট্যানার,—আমার সমস্ত লোকলস্কর লাগিয়ে সারা উগাণ্ডা চষে তোকে খুঁজে বার করব-ই।

যে কথা সেই কাজ। ট্যানার গজরাজের সন্ধান ছেড়ে কেনেথকে খুঁজতেই তার সফরীর সকলকে লাগিয়েছে তখুনি। এমন বেড়াজালে জঙ্গল ঘিরে তল্লাসী চালিয়েছে যাতে একটা খরগোশও না গলে পালাতে পারে।

কিন্তু এই বেড়াজালে ঘেরা তল্লাসীর ভেতর দিয়ে শিকারী কেনেথ গলে এসেছে। এসেছে রাতের অন্ধকারে টাইকুন ট্যানারেরই সফরীর তাঁবু মহল্লায়। সেখানে নিঃশব্দে বন্দুকের মিস্ত্রীকে বন্দী করা শিকারে মারা জানোয়ারদের চামড়া রাখা তাঁবুতে ঢুকে সে কিন্তু অবাক। হাতে একটা ছোরা নিয়ে সে যতটা নিঃশব্দে সম্ভব হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুতে ঢুকেছিল বড় মিস্ত্রীর বাঁধন কেটে তাকে মুক্তি দেবার জন্য। কিন্তু হাত পা-র বাঁধন কেটে সে মুক্তি দেবে কি, বড় মিস্ত্রী নিজেই আগে থাকতে বাঁধন টাঁধন খুলে সেখানে বসে আছে। কেনেথ খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে যাবার পর হঠাৎ চমকে উঠে শুনেছিল—কে তাকে ফিসফিস করে বলেছে,—আর না, ছোরাটা খাপে গুঁজে এবার উঠে বোসো।

গলাটা যে বড় মিস্ত্রীরই তা বুঝে একেবারে হতভম্ব হয়ে উঠে বসে কেনেথ দেখেছিল, বন্দুকের মিস্ত্রী হাত পা খোলা অবস্থায় তার সামনে বসে একটা চামড়ার টুকরোয় কি যেন করছে।

কেনেথকে উঠে বসতে দেখে সেকাজ থামিয়ে মিস্ত্রী বলেছে,—পালিয়ে গিয়েও তুমি যে ফিরে এলে ?

এলাম আপনারই বাঁধন কেটে আপনাকে মুক্ত করা যায় কি না

চেষ্টা করে দেখতে। কিন্তু আপনি নিজেই বাঁধন খুলে বসে আছেন। কি করে খুললেন ওই জংলী কাফ্রী দৈত্যগুলোর অমন শক্ত বাঁধন ?

কি করে খুললাম ?—বন্দুকের মিস্ত্রী একটু যেন হেসে বলেছে—সময় পেলে তোমায় শিখিয়ে দেব, কিন্তু এখন তুমি আর সময় নষ্ট কোরো না। এখুনি পালাও আর যাও উত্তর দিকে !

উত্তর দক্ষিণ কোন দিকেই আর আমি যেতে চাই না—বেশ হতাশভাবে এবার বলেছে শিকারী কেনেথ—আমার হাতের এই ছোরাটা আর কোমরবন্ধের এই পিস্তলটা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। এই নিয়ে গণ্ডা গণ্ডা যাদের কাছে রাইফেল আর বন্দুক আর কমপক্ষে যাট সত্তর জন জঙ্গল ঠেঙিয়ে খোঁজবার লোক-লস্কর তাদের বিরুদ্ধে আমি কি করব আর কোথায় পালাব ? পালাতে হলে আপনি নিজে পালান নি কেন ?

আমি ?—বন্দুকের মিস্ত্রী একটু যেন অবাক হয়ে বলেছেন—হ্যাঁ আমি পালাই নি বটে, তবে এই কাজটা করতে এমন তন্ময় হয়ে গেছলাম যে সময়টা কত কেটেছে ঠিক খেয়াল করি নি।

এমন অবস্থাতেও সময়ের খেয়াল যার জন্যে করেন নি সেটা কি এমন কাজ ?—শিকারী কেনেথ রীতিমত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।

কাজটা কিছু নয়, এই চামড়ার টুকরোর ওপর একটা পেরেক দিয়ে আঁচড়কাটা একটা ছবি !—বলে বড়মিস্ত্রী চামড়ার টুকরোটা কেনেথের হাতেই তুলে দিয়ে বলেছে, এটা তুমিই রাখো। তোমার কাজে লাগবে।

আমি কাছে রাখব এই চামড়ার আঁচড়-কাটা টুকরো ? এটা আমার কাজে লাগবে ? কি বলছেন কি আপনি !—বন্দুকের মিস্ত্রীর মাথাটা ঠিক আছে কি না সে বিষয়েই সন্দেহ ফুটে উঠেছে এবার কেনেথের কথায়।

যা বলছি আজগুবি শোনাচ্ছে, না ?—হেসে জিজ্ঞাসা করেছে বড় মিস্ত্রী—কিন্তু হাতে-হাতে ফল পেলেই বুঝবে আবোল তাবোল কিছু বলি নি। তোমার হাতে যে চামড়ার টুকরোটা দিয়েছি তাতে আঁচড়-কাটা কিসের ছবি তা জানো ? জানবার কথাও নয়। ওটা আঁচড় কেটে যা দেখাবার চেষ্টা হয়েছে সেটা একটা জার-বোয়া। আফ্রিকার ঝানু শিকারী হলেও জার-বোয়া কাকে বলে হয়ত জানো না। জার-বোয়া হল একরকম মরু অঞ্চলের অদ্ভুত ইঁদুর। ইঁদুর না বলে ক্ষুদে ক্যাঙ্গারুও বলা চলে। সামনের পা দুটি ছোট ছোট আর পেছনের গুলি ক্যাঙ্গারুর মত লম্বা বলে শরীরের তুলনায় অনেকদূর পর্যন্ত লাফ দিতে পারে। তোমায় এখান থেকে পালিয়ে উত্তরদিকে যেতে বলেছি, এই উত্তরে চাড্ থেকে শুরু করে সাহারার মরুভূমিতে এই ক্ষুদে ক্যাঙ্গারু জার-বোয়াদের পাওয়া যায়। এই জার-বোয়ার ছাপমারা তাবিজ-পরা আফ্রিকায় এক গুপ্তসমিতি আছে। তারা আফ্রিকাকে ইওরোপের শাদা চামড়ার লোকেদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবার জন্যে গোপনে বিরাট আয়োজন করে যাচ্ছে। তারা তোমার হাতের ওই জার-বোয়ার আঁচড়-কাটা চামড়ার টুকরোটা দেখলেই তোমায় নিরাপদে সাহারা পেরিয়ে মিশরের কায়রো পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। এখন তুমি শুধু উত্তরমুখো গিয়ে উগাণ্ডাটা পার হয়ে যাও।

কিন্তু পার হব কি করে ?—কেনেথ হতাশভাবে বলেছে—বললাম না আমার কাছে শুধু একটা পিস্তল আর একটা ছোরা। পার হবার আগেই ওদের গণ্ডা গণ্ডা বন্দুকে আমি ত ঝাঁজরা হয়ে যাবো।

কিছু হবে না !—বন্দুকের মিস্ত্রী জোর দিয়ে বলেছে, প্রথমত তুমি আফ্রিকার শিকারী, জঙ্গলে কি করে নিঃসাড়ে নিঃশব্দে গাছপালার সঙ্গে মিশে গিয়ে চলাফেরা করতে হয় তা তুমি ওদের সাতজন্ম শেখাতে পারো। সুতরাং ওরা এমনিতে তোমার হদিসই পাবে না।

আর যদি বা পায় ওদের কোন বন্দুকের গুলি তোমার ডাইনে বাঁয়ে দু গজের মধ্যে পৌঁছোবে না।

দু গজের মধ্যে পৌঁছোবে না ?···ঘোর অবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছে কেনেথ,—একি ঝাড়ফুঁক মন্ত্র নাকি ?

না, মন্ত্র নয় যন্ত্র, যন্ত্রের কেরামতি ।—বলেছে বড় মিস্ত্রী—তুমি তাতে বিশ্বাস করে নির্ভয়ে চলে যাও । আর দেরী না করাই ভালো !

কিন্তু আপনি !—যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে সত্যিকার উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছে কেনেথ—আপনি যাবেন না আমার সঙ্গে !

না,—বলে একটু থেমে বন্দুকের মিস্ত্রী কিছুটা কৌতুকের স্বরেই বলেছে— সত্যিকথা বলতে গেলে আমার এখন পোয়াবারো যাকে বলে তাই। যাকে সে হাত পা বেঁধে কাঁচা চামড়ার গুদামের তাঁবুতে বন্দী করে ফেলে দিয়েছিল সকাল না হতেই টাইকুন ট্যানার তার কাছে ছুটে এল বলে ! তারপর আমার আঙ্গুল নাড়ায় টাইকুন ট্যানারকে ওঠ বোস করাতে পারব । সোজা কথা নয় দুনিয়ার সেরা, তার গণ্ডা গণ্ডা সব বন্দুকে নিশানার চারধারে দু গজের মধ্যে গুলি পৌঁছোচ্ছে না কেন, এ ধাঁধার উত্তরের জন্যে তাকে বাঁদরনাচ করাতে করাতে আমি একদিন তাকে রাজধানী কাম্পালাতে বন-বিভাগের বড়কর্তাদের হাতেই তুলে দেব। সুতরাং আমার জন্যে তোমার ভাবনা করবার কিছু নেই । আর হ্যাঁ, তুমি নিজের প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে আমাকে বাঁচাবার জন্যে যে এখানে এমন করে এসেছ, এ ঋণ আমি কোনদিন ভুলব না। কখনো কোথাও যদি দারুণ বিপদে পড় তাহলে, তোমার হাতে যা দিয়েছি, ওই জার-বোয়ার ছাপ দেওয়া একটা বিজ্ঞাপন বিলেতের লণ্ডন টাইম্‌সে ছাপাবার ব্যবস্থা কোরো । আমি যেখানেই থাকি সে বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে তোমায় আমার তখনকার ঠিকানা জানাবই । তারপর তুমি আমার ঠিকানায় চিঠি লিখে তোমার বিপদ আর ঠিকানা জানালেই—আমি বেঁচে থাকলে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াবই, এটা নিশ্চিত জেনো ।

ক্যাম্বিশ ব্যাগের ভদ্রলোক দম নেবার জন্যেই একটু থেমে বললেন—ক'দিনের জন্যে আপনাদের এই শহরটা ছুঁয়ে যাবার সময়ই লণ্ডন টাইম্‌সের বিজ্ঞাপনটা দেখে হাতের কাছে পেয়ে আপনাদের এই বাহাত্তর নম্বরের ঠিকানাটাই জানিয়ে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি বলে একটা উত্তর না আসা পর্যন্ত আর নড়তে পারছি না। আপনাদের তাই বাধ্য হয়ে একটু কষ্ট দিচ্ছি।

না, না, কষ্ট কিসের ?—আমরা প্রায় সমস্বরে বলেছি—যতদিন লণ্ডন টাইম্‌সের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে কোনও চিঠি না পান ততদিন আপনি থাকুন না এখানে,—ওই ওপরের টঙের ঘরটা পছন্দ হলে সেখানেই থাকুন। কিন্তু একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করছি,—টাইকুন ট্যানার আপনাকে বন্দুকের পাকা মিস্ত্রী বলে তার সফরীতে নিয়েছে আবার শিকারী কেনেথকে আপনি যেভাবে জার-বোয়া ছাপের তাবিজ-পরা আফ্রিকার গুপ্ত বিপ্লবীদলের খবর দিয়ে ভরসা দিয়েছেন তাতে মনে হয় ওই জার-বোয়া ছাপের গুপ্ত দলের সঙ্গেও আপনার ভালোরকম যোগাযোগ ছিল। এখন আবার আপনাকে দেখছি এই আমাদের কলকাতা শহরে। আসল পরিচয়টা তাহলে আপনার কি ?

হ্যাঁ, কেনেথও ওই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল আমাকে চামড়ার জার-বোয়া ছাপ নিয়ে তাঁবু থেকে জঙ্গলের পথে চলে যাবার সময়। তাকে যা বলেছিলাম, তাই আপনাদের বলি,—নিজের পরিচয় কি কেউ আমরা জানি ! সেই পরিচয়ই ত সবাই খুঁজছি সারা জীবন।

আমাদের হতভম্ব করে ওইটুকু বলেই টেবিল থেকে ক্যাম্বিশের ব্যাগটা নিয়ে তেতলার ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির দিকে চলে গিয়েছিলেন।

ক্যাম্বিশের ব্যাগটা না থাক ভদ্রলোক এখনো আমাদের টঙের ঘরেই আছেন। না থেকে উপায় কি ? লণ্ডন টাইম্‌সের জার-বোয়া ছাপ-মারা বিজ্ঞাপন-দাতার উদ্দেশে লেখা তাঁর চিঠির জবাব যে এখনো আসে নি।

হ্যালিং-র বেচাল

দেখা গেছে ?

হ্যাঁ দেখা গেছে ! ঊনিশশ পঁচাশি বারোই নভেম্বর তারিখের খবর তাই ।

কি দেখা গেছে যা নিয়ে এত উত্তেজনা, তা নিশ্চয় এখন আর বলতে হবে না । কোথা থেকে কেমন দেখা গেছে সেইটেই আসল খবর ।

দেখা গেছে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস্ থেকে, দূরবীন-টুরবিন নয় একেবারে খালি চোখেই । এইটিই যা বারোই নভেম্বর তারিখের খবর ।

লস অ্যাঞ্জেলস্-এর বাসিন্দাদের ঈর্ষা করবার কোনো কারণ কিন্তু নেই । আমেরিকার চিত্র-তারকাদের নিজস্ব মুলুক বলে ভাগ্য তাদের ওপর বেশি সুপ্রসন্ন এ কথা ভাবাও ভুল । যা দেখতে পাওয়া নিয়ে এত হৈ চৈ দুদিন বাদে সারা পৃথিবীর মানুষই প্রাণভরে তা দেখতে পাবে ।

কিন্তু এই দেখতে পাওয়াটাই এমন কিছু কি বড় খবর ?

যা দেখবার কথা হচ্ছে তা যে হ্যালির ধূমকেতু তা আর নিশ্চয়

হাঁকডাক করে জানাতে হবে না। হ্যাঁ হ্যালির ধূমকেতু আসছে, আসছে যেমন তার নিয়ম, সেই ছিয়াত্তর বছর বাদে। সে আসবে তার লম্বা আগুনের লেজটা পেছনে ছড়িয়ে আমাদের সূর্যকে একটা পাক দিয়ে আবার ফিরে যাবে যেখান থেকে এসেছিল সেই অজানা সুদূর নিরুদ্দেশে।

ব্যাপারটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই, কিন্তু নতুন কিছু নয়। এক জীবনে কোনো একজন একবারের বেশি দুবার ও ঘটনা দেখবার সুযোগ পায় নি বললেই হয়। কিন্তু বিশেষ কোনো একজন পেলেও পৃথিবীর মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে এ ঘটনা যে দেখে লক্ষ্য করে আসছে। আরো অনেক কিছুর সঙ্গে আমাদের মহাভারতেও তার প্রমাণ আছে। যেমন তেমন প্রমাণ নয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটাই যে এই ধূমকেতুর অশুভ আবির্ভাবের ফল এমন ইঙ্গিতও নাকি দেওয়া আছে সেখানে।

তাই স্বীকার করতেই হচ্ছে যে হ্যালির ধূমকেতুর আসা যাওয়া একটা অসাধারণ ঘটনা হলেও একেবারে নতুন অজানা কিছু নয়।

হ্যালির ধূমকেতু আগেও যেমন এসেছে আর কিছুদিনের জন্যে রাতের আকাশের পরম বিস্ময় হয়ে থেকে সূর্যদেবকে একবার পাক দিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, এবারও তাই যাবে।

কিন্তু ব্যাপারটা এবার শুধু তাই কি ?

এই 1985-র 2রা জুলাই ফরাসী গায়নার কোস্ট থেকে গিয়োত্তো নামে যে রকেট ছোঁড়া হল সেটা কি নিছক বাহাদুরী ! কি মতলবে জলের মত পয়সা খরচ করে ইওরোপিয়ান স্পেস এজেন্সী বৃটিশ এরোস্পেস-এর সঙ্গে থেকে সত্তর কোটি কিলোমিটার পাড়ি দেবার জন্য এই রকেট ছোঁড়ার ব্যবস্থা করেছে !

হ্যাঁ, লক্ষ্য যে হ্যালির ধূমকেতু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু গিয়োত্তোকে ছোঁড়া হয়েছে যেদিন দিয়ে হ্যালি-র ধূমকেতু আসছে তার উল্টো দিক থেকে তার সঙ্গে মোলাকাৎ-এর জন্যে। আর সে

মোলাকাৎ যদি সত্যিই হয় ত হবে সেই 1986-র 13ই মার্চ 'গ্রীনিচ্' মানা ঘড়ির হিসাবে সন্ধ্যা 6টা 30 মিনিট থেকে পরের দিন 14ই মার্চ বেলা তিনটে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে। সে সাক্ষাৎ যদি হয় তাহলে 960 কিলোগ্রাম ওজনের তিন মিটার লম্বা গিয়োত্তো তার খবর যা পাঠাবে সে রেডিওবার্তা পৃথিবীতে পৌঁছোতে অন্তত আট মিনিট লাগবে।

কিন্তু খবর কি সত্যিই পাঠাতে পারবে গিয়োত্তো?

যদি পারেও তাহলে কেমন আর কি হবে সে খবর?

কি বলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধুরন্ধরেরা? কি বলেন আপনাদের টঙের ঘরের তিনি?

★ ★ ★ ★

এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা পড়ে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে রণং দেহি চ্যালেঞ্জটা সেই মৌ-কা-সা-বি-স-এর।

কিন্তু এ চ্যালেঞ্জের জবাব কেমন করে দেওয়া যাবে? টঙের ঘরের তাঁকেও আসরে নামান যাবে কি করে?

নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে কোনো রাস্তাই যখন ঠিক করতে পারছি না তখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া দিয়েই আসরটা জমানো যায় কিনা সে চেষ্টার কথা ভাবা হল।

হ্যাঁ, সোজাসুজি ঝগড়া। হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে প্রায় হাতাহাতির অবস্থা পাকিয়ে তুলতে হবে।

ছিয়াত্তর বছর অন্তর দেখা দেওয়া ধূমকেতু এবার কি করবেন তাই নিয়ে যার যার নিজের কল্পনার লড়াই।

সুবিধে হয়ে গেল সকালের রেডিও মারফৎ খবরটা শোনায়। তারিখ 27শে নভেম্বর। হ্যালির ধূমকেতু আজই নাকি আমাদের দেশের আকাশে দেখা দিচ্ছেন। তবে খালি চোখে নয়, তাকে দেখতে হলে দূরবীন যোগাড় করতে হবে।

খবরটা 27শে সকালে পেলেও দূরবীনে দেখার মত হ্যালির ধূমকেতুর আবির্ভাব নাকি হয়েছে 21শে নভেম্বর সূর্যাস্তের পর।

বিশ্বাস করি না—

সমস্ত আড্ডাঘর এক মুহূর্তে চমকে একেবারে স্তব্ধ করে দেওয়া এ কার গলা ?

আর কারো নয় আমাদের শিবুরই।

গুরু নানকের জন্মদিন বলে ছুটি থাকায় সকালেই সবাই এসে আড্ডাতে জমায়েৎ হয়েছি। বনোয়ারী সুরভিত চায়ের ট্রে নিয়ে নিচে থেকে উঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই টঙের ঘরের তিনিও এসে তাঁর মৌরসী আরামকেদারা দখল করে শিশিরের মুখে সকালের বেতার সংবাদ শুনছেন এমন সময় শিবুর এই চমকে দেওয়া ঘোষণা।

নিজের ঘোষণাটা আরো জোরালো করবার জন্যে শিবু দ্বিতীয়বার সেটা গলা চড়িয়ে শোনালো—বিশ্বাস করি না আমি।

বিশ্বাস করো না ? কি বিশ্বাস করো না ? খানিক বিস্ময় বিমূঢ়তার পর আমাদের প্রশ্ন।

কি বিশ্বাস করি না ?—শিবু নিজের বক্তব্যটা জোরালো করবার জন্যে প্রশ্নটা নিজেই আবার আউড়ে নিয়ে উত্তর দিলে—বিশ্বাস করি না তোমাদের ওই জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের হিসেব নিকেশ।

বিশ্বাস করো না—একেবারে হতভম্ব হয়েই বললাম,—কত যুগ যুগ ধরে যারা হিসেব মিলিয়ে আরো অনেক কিছুর জন্য এই ধূমকেতুর গতিবিধির নির্ভুল গণনা করে এসেছেন তাঁদের বিশ্বাস করো না ? এতদিনে তাঁদের হিসেবের ভুল কোথাও ধরা পড়েছে ?

ধরা পড়েনি বলেই ভুল যে হয় নি তার ঠিক কি-শিবু হার না মেনে বললে,—আর আগে যদি ভুল নাও হয়ে থাকে এবারে হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

তোমার ধারণা—তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললাম—তোমার ধারণা মতে কি এবার হবে শুনি ? হ্যালির ধূমকেতু এবার আসবে

না ?

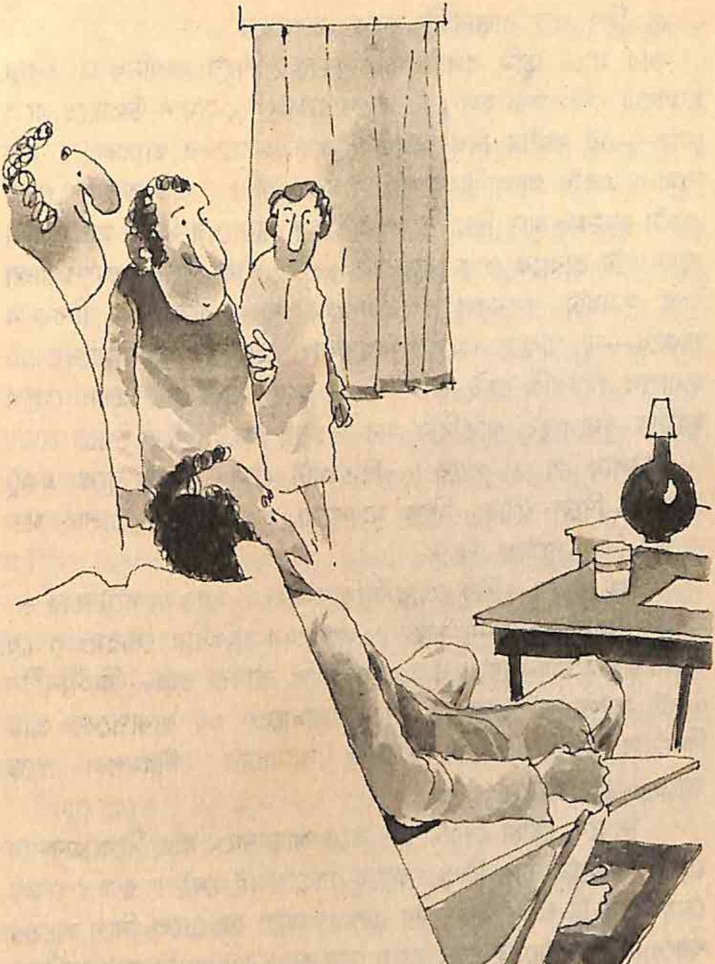
আসবে না, বলছি না—শিবু জোর দিয়ে বলে চলল—এসেই যখন পড়েছে তখন আসবে না বলবে কোন আহাম্মুক, কিন্তু যেখান দিয়ে যেমন করে এসে যতদিন থাকবে বলা হচ্ছে সেসব হিসেব মিলবে না।

তার মানে—বিদ্রূপের সুরেই বললাম,—তা হলে হ্যালির ধূমকেতু আমাদের এই পৃথিবীর ওপরই আছড়ে পড়তে পারে !

তা পারে না এমন নয়।—শিবু আমাদের বিদ্রূপটা গ্রাহ্য না করেই যেন ধৈর্য ধরে বোঝালো, এর পরে কোনোবার হয়ত এসে পড়বে। তবে এবারে অমন একটা দুর্ঘটনা ধরতে না পারার মত হিসেবের ভুল হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তবে ভুলচুক কিছু যে না হয়ে পারে না সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ার মত ব্যাপারে না হোক সে ভুল হ্যালির ধূমকেতুর এবারের গতিবিধিতেই ধরা পড়বে।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, আর কেন ? শিশির তর্কটা সিধে রাস্তায় চালাবার চেষ্টায় বললে—ধূমকেতু ত এসে পড়েছে তখন তার গতিবিধির বেয়াড়াপনা দেখতে পাব আর ক'দিনের মধ্যে। কিন্তু জ্যোতির্বিদদের গণনায় ভুলচুক যে হবেই এ ধারণার ভিতটা কি জানতে পারি ?

নিশ্চয় পারো।—শিবু তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বোঝালো—জ্যোতির্বিদেরা মূর্খ অথবা আনাড়ি গণক অবশ্যই নয়। তবু তাদের ভুল না হয়ে পারে না। আর সে ভুল হবার কারণ, যার কণামাত্র আমরা জেনেছি সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতল রহস্য। জ্যোতির্বিদেরা তাঁদের দূরবীন আর রেডিও-টেলিস্কোপ দিয়ে যেটুকু হদিস পান তা দিয়ে সে অসীম অতল রহস্যের কতটুকু অঙ্কের ছকে ফেলতে পারেন ? এ যেন পুকুরের জলের ঢেউ দেখে অপার সমুদ্রের রহস্যের ব্যাখ্যা করা।



না শিবু বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলছে।

তার মানে তুমি বলতে চাও—বলে শিবুর দার্শনিকতা এবার থামাবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু সে থামল না, সমান উৎসাহে বলে চলল—এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের ছায়াপথের মত সামান্য একটা গ্যালাক্সি অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডলের এককোণে ছোট্ট একটা ধূমকেতু মাত্র ছিয়াত্তর বছর অন্তর আমাদের সূর্যের মত একটা ছোটখাটো তারাকে পাক দিয়ে যায়। সেই পাক দিয়ে যাওয়ার রাস্তা আর সময়টা অনেককাল একরকম ছিল বলে কি চিরকাল থাকবে—না, থাকতে পারে ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে দিলাম, আমাদের এই ছায়াপথ গ্যালাক্সি-তেই কত কি না হচ্ছে যার ঢেউ এসে লেগে হ্যালির ধূমকেতুর গতিবিধি সব তছনছ করে দিতে পারে।

মানলাম যে তা পারে।—বিতণ্ডাটা যেন জমেছে বুঝে একটু উসকানি দিলে গৌর—কিন্তু মহাশূন্যে অমন ঢেউ তোলার মত তেমন কিছু ঘটেছে কি ?

ঘটেছে নিশ্চয়—শিবু জোর দিয়ে বললে,—আর যা ঘটে তার—, সব কি আমাদের জানা সম্ভব ? আমাদের পৃথিবীর সৌরমণ্ডল যে গ্যালাক্সির অর্থাৎ ছায়াপথে আমরা আছি, আমরা তার—কি দীনহীন একটা সদস্য তা জানো ? জানো আমাদের এই ছায়াপথের প্রায় কিনারার কেন্দ্র থেকে কতদূরে আমাদের সৌরমণ্ডল পড়ে আছে—তুমি জানো ?

শিবুকে খোঁচা দেবার ছল করে আড়চোখে যাঁর দিকে একবার চেয়ে দেখলাম তাঁর কিন্তু কোনো সাড়াশব্দই নেই ! এক পেয়ালা শেষ করে টী-পট থেকে আর এক পেয়ালা চা ঢেলে নিয়ে হাতের খবরের কাগজটাতেই যেন তন্ময় হয়ে আছেন। এমনি করে সাজিয়ে তোলা চালগুলো কি তাহলে ভেস্তেই গেল !

ওদিকে শিবু আবার তার নিজের ফাঁদেই না পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। ছায়াপথের কোন দূর কিনারায় আমাদের সৌরমণ্ডলের

হেলায় ফেলায় পড়ে থাকার কি সব আঁকজোকের কথা বলছিল তা শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবে ?

তা পারল শিবু। বেশ একটু মাতব্বরী চালেই বললে,—আমাদের এই ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে আমরা যত দূরে আছি তার সেকেণ্ডে যে আলোর গতি এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল সেই আলোর সমান বেগে ছুটতে পারলেও আমাদের ত্রিশ হাজার বছর লেগে যাবে। এই দূরত্ব থেকে যে বিশালতার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে যা কিছু হচ্ছে তা আমরা জানব কি করে ? তোমরা বলবে যে সেই মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি ছিয়াত্তর বছর পরে পরে কতবার হ্যালির ধূমকেতু ঘুরে গেছে। কম বেশী সেই পাঁচ হাজার বছরে তার গতিবিধির কোনো এদিক ওদিক হয়েছে কি ? হ্যাঁ মানছি যে সামান্য কিছু গতিবিধির অদল বদল যদি হয়েও থাকে তা ঠিক ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু আমাদের কাছে অনেক মনে হলেও যে সময়টার অল্পবিস্তর সঠিক খবর আমরা পাচ্ছি তাই মাত্র পাঁচ হাজার বছর। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ড কারখানায় পাঁচ হাজার বছর কি একটা হিসেবে ধরবার মত সময় ? আমাদের এই গোটা ছায়াপথ গ্যালাক্সি চরকির মত অনবরত পাক খাচ্ছে তা জানো বোধ হয়। একটা পাক পুরো করতে তার কত সময় লাগে ভাবতে পারো ? লাগে লাগে···এই আন্দাজ দশ···দশ···

শিবুর তোতলামির মাঝখানে হঠাৎ আড্ডাঘরটা কাঁপিয়ে বাজখাঁই গলায় ধমক শোনা গেল—না। কুড়ি কোটি বছর !

হ্যাঁ বারুদের পলতেটা ঠিকই ধরেছে শেষ পর্যন্ত। ঘরের ছাদ কাঁপানো গলার ধমকটা আর কারো নয়, মৌরসী কেদারার সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাঁরই। তিনিই আগের শেষ করা পেয়ালাটা সামনের টী-পট-এ নামিয়ে রেখে বললেন—হ্যাঁ আমাদের ছায়াপথের একবার পুরোপুরি পাক খেতে লাগে পাক্কা কুড়ি কোটি বছর। আর আমাদের এই ছায়াপথ গ্যালাক্সি-র বয়স হল বারো শ' থেকে দু

হাজার কোটি বছর। হ্যালির ধূমকেতুর খবর যখন থেকে অল্পবিস্তর পেতে শুরু করেছি সেই পাঁচ হাজার বছর ওই অশেষ যুগযুগান্তের কাছে ত চোখের একটা পলকের বেশী নয়। সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত এ ধূমকেতুর অনেক চাল বেচাল হয়েছে ভাবলে তাই ভুল কিছু হবে না। তারপর মাত্র পাঁচ হাজার বছর সুশীল সুবোধ থেকে এবারই তার হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে কিছু বেচাল দেখানো তাই মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু বেচালটা তার কি ধরনের হতে পারে আর কেন, সেইটেই ভাববার!

ঘনাদা থামলেন। শিশিরও প্রস্তুত। ঘনাদার কথা শেষ হতে না হতেই তার নতুন সিগারেটের টিন খোলার মৃদু শিসের আওয়াজ শোনা গেল। তারপর ঘনাদা তা থেকে সিগারেট তুলে মুখে ঠোঁটের ফাঁকে বসাতে না বসাতেই শিশিরের লাইটার জ্বালার মৃদু শব্দ শোনা যায় কানে।

সিগারেট ধরিয়ে ঘনাদা হাল্কা থেকে শুরু করে গোটা তিনেক রাম টান দিয়ে এক কুণ্ডলী ধোঁয়া না ছাড়া পর্যন্ত আমরা অধীর আগ্রহে খানিক চুপ করে থেকে ছেড়ে দেওয়া খেইটা একটু ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় দ্বিধাভরে বললাম—হ্যালির ধূমকেতুর বেচাল তাহলে এবার সত্যি হতে পারে? তা বেচালটা কিরকম?

কথা শেষ হতে না হতেই ঘনাদার ধমক—কিরকম হতে পারে আর কেন তা নিজেরাই একটু ভেবে বল না।

নিজেরাই ভেবে দেখব? চালের ভুলে শেষ কিস্তিটাই কাঁচিয়ে দিলাম নাকি? ঘনাদা কি চটেছেন নাকি?

না, গলাটা কড়া হলেও ঘনাদা বেশ তৃপ্তিভরেই সিগারেটে সুখটান দিলেন। দরকার এখন তাঁকে একটু তোয়াজ করা। তাই করলাম।

বোকা সেজে বললাম—বেচাল কি আর কেন হতে পারে বলব—বেচাল হবে আমাদের গ্যালাক্সির ওই যে বলেছেন ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরের কেন্দ্র সেখানে কোথাও কোনো

সুপার-নোভা নক্ষত্রের বিস্ফোরণের দরুন আর তার ধাক্কায় হ্যালির ধূমকেতু এবার সূর্যকে পাক দেওয়ার বদলে হয় তার ভেতর মরণ ঝাঁপ দেবে কিংবা কোনরকমে মান বাঁচিয়ে খসে যাওয়া লেজটা শুধু রেখে পালাবে।

লেজটা তোমার জন্যেই রেখে যাবে—আমার বাড়িয়ে দেওয়া চালটা শিশির উচিত মতই চড়াতে ভুল না করে বললে, সুপারনোভা অমন অনেক ফেটেছে আমাদের গ্যালাক্সিতে গত হাজার বছরে তার জন্য অবশ্য হ্যালির ধূমকেতুর কোনো বেচাল আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে জানি না। না ঘনাদা আপনি বলুন কি বেচাল দেখব এবার হ্যালির ধূমকেতুর—

কি বেচাল দেখব তা কেউই ঠিক করে বলতে পারে না, তবে···

ঘনাদা যেন সুদূর মহাশূন্যেই নিজেকে চালান করে দিয়ে বললেন, তবে হয়ত হতে পারে এমনসব কিছু ব্যাপার অনুমান করতে পারি। তার যা এবার হতে পারে বা হতে যাচ্ছে আমাদের নিজেদেরই কর্মফল। হ্যাঁ ফ্রেঞ্চ গায়নার কোস্ট থেকে ছোঁড়া গিয়োত্তো হয়ত তাকে যা হুকুম তার চেয়ে আলাদা বেশী কিছু করবে। হয়ত তার গণকযন্ত্র ভুল করে বসবে আর সেই ভুলের দরুন হ্যালির ধূমকেতু থেকে এক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে তার খবর নেবার বদলে সে ধূমকেতুর মাথায় ঝাঁপিয়ে টুঁ মেরে বসবে আর তাতে যা হবে সেইটেই আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ব্যাপার। গিয়োত্তোর গুঁতোয় ধূমকেতুর মাথা কিংবা লেজ থেকে যা বেরিয়ে আসবে সেইটেই সাত রাজার ধন মাণিকের চেয়ে অবাক করা এক বস্তু। পৃথিবী থেকে লক্ষ্য রাখা দূরবীনে সে বস্তুর দেখা পাওয়া মাত্র পৃথিবীর দুই মহাশক্তির কেউ হয় ফেরি-রকেট চ্যালেঞ্জারে নয় অন্য কোনো মহাকাশযানে তাকে উদ্ধার করে আনবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উদ্ধার করার পর সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়ের আর সীমা থাকবে না জিনিসটা কি তা বুঝতে পারার পর। জিনিসটা একটা অসাধারণ টি ভি ক্যামেরা যা হ্যালির ধূমকেতুর ভেতরে গাঁথা হয়ে থেকে আগাগোড়া তার ছিয়াত্তর বছরের

মহাকাশ পরিক্রমার সব বিবরণ ধরে রেখেছে। পৃথিবীর মানুষেরা এরকম একটা যন্ত্র হ্যালির ধূমকেতুর ভেতরে গেঁথে তার ছিয়াত্তর বছরের পাড়ির সব বৃত্তান্ত ধরে রেখে সংগ্রহ করার কথা ভাবছিল। সে চেষ্টা তাদের আর করতে হল না।

এটা যে কল্পনাতীত আশাতীত সৌভাগ্য সে কথা আর বলবার নয়, কিন্তু কথা যা হবে তা এই যে এমন আশ্চর্য যন্ত্র কারা তৈরী করে হ্যালির ধূমকেতুর মধ্যে গেঁথে দিয়েছে। ছিয়াত্তর বছর আগে দূরদর্শন ক্যামেরা কি রকেট বিজ্ঞান ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষেরও হাতেখড়ি মাত্র হয়েছে বলা যায়। এমন আশ্চর্য কীর্তি তাহলে কার ?

সৌরমণ্ডলের কোনো গ্রহে উন্নত সভ্যতা দূরে থাক বুদ্ধিমান কোনো প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে তার ছিয়াত্তর বছরের পরিক্রমায় হ্যালির ধূমকেতু আরো অনেকদূর পর্যন্ত টহল দিয়ে আসে বটে কিন্তু তাও চার দশমিক তিন আলোকবর্ষ দূরের আমাদের সবচেয়ে কাছের তারকা প্রক্সিমা সেনটোরির চেয়ে দূরে নয়। এরকম একটা যন্ত্র বানিয়ে তা হ্যালির ধূমকেতুতে গেঁথে দেওয়ার ক্ষমতা যাদের হয়েছে এমন উন্নত সভ্যতায় পৌঁছোনো প্রাণী তাহলে আছে কোথায় ? আমাদের কোনো দূরবীনে তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি কেন এতদিন, এইটেই হবে আমাদের ভাবনা। তবে এ প্রশ্নের উত্তরও আছে।

পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের তারা পর্যন্ত ফাঁকা মহাশূন্যে খানিকটা কালো নীহারিকার এলাকা যে আছে তাও আমরা দেখেছি। মহাকাশের মুলুকে অন্ধকার কত কি যে লুকিয়ে রাখে কে জানে, মানুষেরও আগে দূরদর্শন বা রকেট-যন্ত্র আবিষ্কারের মত উন্নত সভ্য প্রাণীর হয়ত সেখানে কোথাও বাস। তাদের দূরদর্শন যন্ত্র থেকেও তাদের বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করতে পারি।

এখন শুধু তারই অপেক্ষায় থাকা—শিশিরের সিগারেটের টিনটা অন্যমনস্কভাবে পকেটে নিয়ে টঙের ঘরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন—১৯৮৬-র ১৩ই মার্চ ত আর খুব বেশী দূরে নয়।

জয়দ্রথ বধে ঘনাদা

(১)

"মহাভারতে নেই।"

"না আছে।"

"কোথাও নেই।"

"আলবৎ আছে। ওই মহাভারতেই।"

"বাজে কথা। পড়েছ মহাভারত?"

"পড়েছি বলেই বলছি। ওই মহাভারতেই আছে, ভালো করে পড়ে দেখো।"

ওপরের কোটেশন চিহ্ন দেওয়া বাক্যালাপগুলো পড়েই ওগুলোর অকুস্থল বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেন নামে কোনো গলির একটি না নূতন না পুরাতন মুক্তছাদের একটি মাত্র ত্রিতল নাতি-প্রশস্ত গৃহযুক্ত অট্টালিকা বলে যাঁরা ধরে নিয়েছেন, তাঁরা ভুল কিছু করেন নি।

কথাগুলি ওই বাহাত্তর নম্বরের দোতলার বৈঠকী ঘরেই শোনা গেছে। এবং সেগুলি তেতলার টঙের ঘরের সেই 'তিনি'-কে শোনাবার জন্যেই উচ্চারিত।

কিন্তু এ মেসবাড়ির সে মামুলী দস্তুরের সঙ্গে মিল ওইটুকুই—ওই

ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে টঙের ঘরের তাঁর চটির শব্দ পাওয়া থেকে সে শব্দ বারান্দায় এসে পৌঁছানো পর্যন্ত গলা ছেড়ে তাঁকে শোনাবার মত আওয়াজে ওইসব আলাপ উত্তেজিত হয়ে চালিয়ে যাওয়া।

মিলটা তারপর ওইখানেই শেষ। তাঁর চটির আওয়াজ বারান্দা থেকে আমাদের বৈঠকী ঘরের দিকে এগোবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চাল একেবারে আলাদা। অনেকদিন অনেক গোপন পরামর্শসভার তর্কাতর্কির পর ঘনাদার ওপর এই চাল চালাই সাব্যস্ত হয়েছে।

এ চালের সপক্ষে সবচেয়ে জোরালো ওকালতি করেছে গৌর। বলেছে—ঘড়ি কি টিক্‌টিক্ বন্ধ করে টিকতে পারে ? জিন্দা আর জাগা থাকলে গোলা পায়রা কি বক্‌বকম থামাতে পারে ? নিলেমের হাটের ফড়ের সবচেয়ে বড় সাজা কি ? কথার তুবড়ি ছোটাতে না পারুক, দু'চারটে জুতসই ফোড়ন কাটতে না পারা। ঘনাদাকে সেই সাজাই আমরা দেব।

তারপর দেখব, গৌরকে মদৎ দিয়েছে শিশির, এ সাজায় চিড়বিড়িয়ে মৃগীর রুগী না হয়ে উঠে উনি ক'দিন চাঙ্গা থাকতে পারেন ?

ঘনাদাকে এই মোক্ষম সাজা দিতেই আমরা ক'দিন এই নতুন চাল চালছি !

চাল খুব ঘোরালো প্যাঁচালো কিছু নয়। শুধু ঘনাদার মুখে এক রকম কুলুপ দেওয়ার ব্যবস্থা।

চালটা সোজাসুজি তাই এই। সকাল বিকেল তেতলার ন্যাড়া ছাদ থেকে নামবার সিঁড়িতে ঘনাদার চটি ফটফটানি শুনলেই আমরা তাঁকে শোনাবার মত ছাড়া গলায় ওই মহাভারত বা আরকিছু নিয়ে জোর তর্ক শুরু করব। কিন্তু তিনি বারান্দায় নেমে বৈঠকী ঘরে এসে ঢোকার আগেই সব একেবারে চুপ।

তিনি প্রথমবারে ওই অবস্থায় ঘরে এসে মুখে কিছু বলেন নি, শুধু একটু সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে আমাদের সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে

ছিলেন।

কিন্তু আমরা সবাই তখন একেবারে ধোওয়া তুলসি পাতা। খল প্যাঁচ কিছু আমাদের মুখে ফুটবে কোথাথেকে ?

দ্বিতীয়বার ঘনাদা আর মুখ না খুলে পারেন নি।

সেদিন আমরা একটু অপ্রস্তুতই ছিলাম। ঘনাদা তাঁর বাঁধাধরা সময়ের একটু আগে নেমে আসায় ভেবেচিন্তে তৈরী করে রাখা কিছু তর্ক তুলে তাঁকে ছটফটানি ধরাবার ব্যবস্থা করতে পারি নি। তার জায়গায় হঠাৎ ন্যাড়া সিঁড়িতে তাঁর চটির আওয়াজ পেয়ে যা তৎক্ষণাৎ মাথায় এসেছে তাই শুনিয়েছি গলা চড়িয়ে।

না, কালবোশেখী আর হবে না।—শিশিরই প্রথম যা হোক করে একটা প্রসঙ্গ তুলেছে

হবে না মানে ?—শিবু যেন মানহানির মামলা রুজু করেছে। কালবোশেখী বন্ধ হলে—

এ দেশ রাজস্থান হবে।—শিবুর খুঁজে না পাওয়া জবাবটা পূরণ করে দিয়েছিল গৌর।

হবে কেন ? রাজস্থানই ত হচ্ছে—শিশির জোরগলায় ওই শেষ কথাটি বলেই চুপ হয়ে গিয়েছিল, কারণ বারান্দার দরজা দিয়ে ঘনাদা তখন আড্ডাঘরে পা দিয়েছেন।

আমাদের সকলের মুখ হঠাৎ কুলুপআঁটা হয়ে গেলেও ঘনাদা কিন্তু আগের দিনের মত নিজেও চুপ হয়ে থাকতে পারেন নি। দরজা থেকে এসে তাঁর মৌরসী আরামকেদারাটি দখল করতে করতেই নিজের আগ্রহটা লুকোতে একটু হালকা সুর লাগিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন-কি তর্ক হচ্ছিল হে ?

আমরা সবাই তখন বোবা। প্রশ্নটা যেন বুঝতেই পারি নি, এমনভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছি।

ঘনাদা অধৈর্যটা পুরোপুরি আর চাপতে না পেরে একটু ঝাঁঝালো গলাতেই বলেছেন,—কি নিয়ে অত চেঁচামেচি করছিলে, বলেই

ফেলো না।

এতক্ষণে যেন অতি অনিচ্ছায় মুখ খুলে গৌর বলেছে—আজ্ঞে, ও কিছু না!

কিছু না!—ঘনাদা বেশ কষ্ট করেই গলাটা যথাসাধ্য ঠাণ্ডা রেখে বলেছেন, কিন্তু রাজস্থান নিয়ে কি যেন চেঁচাচ্ছিলে মনে হল?

রাজস্থান! প্রথমে বেশ একটু অবাক হবার ভান করে, তারপর উদাসীন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম—হ্যাঁ, কিছু বলছিলাম বোধহয়, ঠিক মনে পড়ছে না।

মনে পড়ছে না।—ঘনাদার গলার আওয়াজেই এবার আর সন্দেহ করবার কিছু থাকে না যে সলতের আগুন খোলের ভেতরের মসলায় গিয়ে লেগেছে।

তা লাগুক! তবু এখনও নয়। ও সোঁ-সোঁ আওয়াজ পেয়েই এখুনি ছাড়লে কাজের কাজ কিছু হবে না। আঙুলের টিপুনিতে শুধু একটু ঘুরপাক খেয়েই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে ফেঁসে যাবে।

তাই ভেতর থেকে একেবারে ঠিক্‌রে বার হবার মত প্রচণ্ড সেই ঠেলাটা আসার জন্যে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।

একবার সে ছুটি-কি-ফাটি বেগ এসে গেলে আর ভাবনা নেই। দু' আঙুলে টিপে একটু পাক দিয়ে ছেড়ে দিলেই উড়ন তুবড়ি ক'পাক ঘুরে মাটি ছুঁতে গিয়েই আবার যেন ছোঁ মারা হয়ে তেশূন্যে উঠে যাবে।

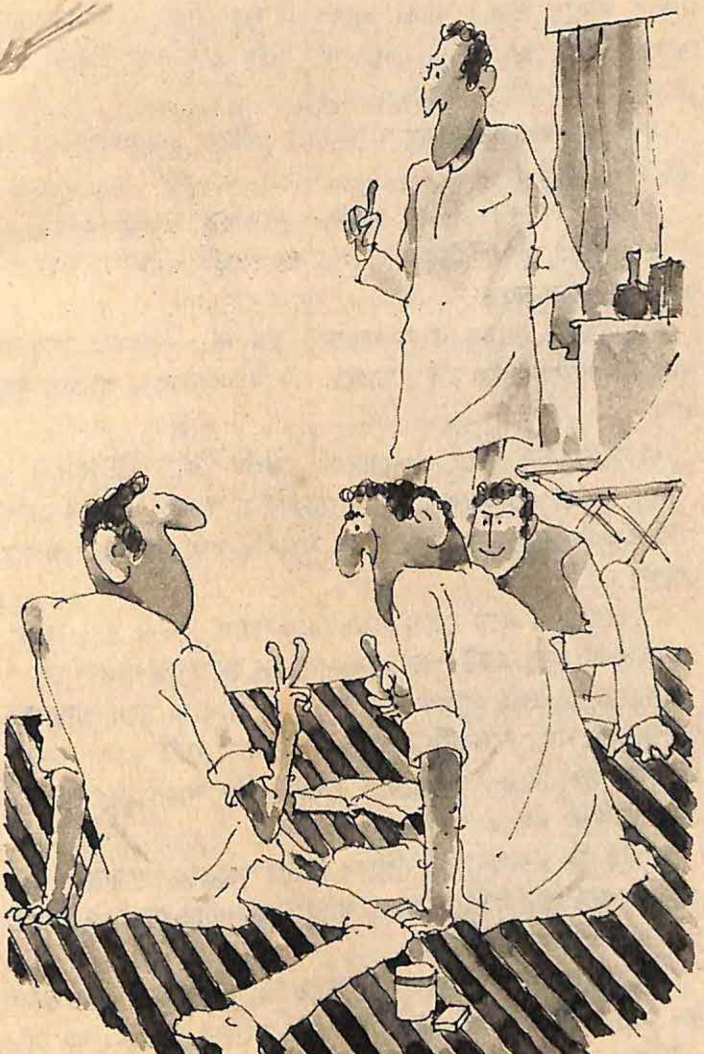
যার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম সেই প্রচণ্ড বেগের ঠেলাই এরপর একদিন টের পেলাম।

শুধু সোঁ-সোঁ ডাক নয়, যে হাতের যে যে আঙুলে ধরে রাখা, সব একেবারে যেন ছিড়ে নিয়ে ছুটে যাবার ছটফটানি।

মওকা বুঝে আমরাও ঠিকমত পাক লাগালাম এবার।

মওকাটা এল মহাভারতের কথা নিয়েই।

আমাদের অবশ্য সেদিন আগে থাকতে রিহার্সেল দিয়ে তৈরী



থাকার সুবিধে ছিল। ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির মাথায় ঘনাদার চটি ফটফটিয়ে উঠতেই উদারা মুদারা বাদ দিয়ে একেবারে তারায় তান ছেড়েছিলাম সবাই মিলে।

সব বাজে কথা!—প্রথম গলাবাজিটা গৌরের।—মহাভারতে ও সব কিচ্ছু নেই।

আলবৎ আছে!—শিবুর গর্জন,—পড়েছিস মহাভারত?

হ্যাঁ পড়েছি।—গৌরের আস্ফালন, সব পড়েছি—ব্যাসদেব থেকে কাশীরাম দাস সব।

শুধু যেমন তেমন করে পড়লেই হয় না।—আমার শিবুকে সমর্থন—পড়তে জানা চাই। তাহলে দেখবি মহাভারতে যা চাস সব আছে।

যা চাইব সব আছে?—গৌরের ভেংচি কেটে টিট্‌কিরি!

হ্যাঁ, মহাভারতে আছে।—ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘনাদার আজ আর প্রশ্ন-ট্রশ্ন কিছু নয়—একেবারে সরাসরি বাড়ি কাঁপানো গলায় ঘোষণা।

ভেতরে চলে এসে মৌরসী আরামকেদারায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘোষণায় আর একটু সংযোজন—পড়তে জানলেই পাওয়া যায়।

পড়তে জানলেই পাওয়া যায়! হ্যাঁ, আজ আর মুখে আমাদের কুলুপ-টুলুপ নয়। একেবারে প্রথম থেকেই যুদ্ধং দেহি তাল ঠোকা শিশিরের গলা দিয়ে—মহাভারতে একটা অতি সোজা প্রশ্নের জবাব কোথায় পাব বলতে পারেন?

প্রশ্নটা কি?—ঘনাদা শিশিরের 'আও লড়েঙ্গে' গোছের তাল ঠোকার সঙ্গে তার বাড়িয়ে ধরা সিগারেটের টিনটার ভেতরও আঙুল চালিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।

প্রশ্নটা হল···শিশির যেন ভেবে নিতে গিয়ে মুশকিলে পড়ে হঠাৎ দুম করে বলেছে—এই···এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটার কথাই ধরুন না। ওটা কবে হয়েছে কিছু বলতে পারেন? আছে সেকথা মহাভারতে

কোথাও ? কই বলুন না ?

কিন্তু বলবেন কি করে ? ঘনাদা তখন শিশিরের টিন থেকে হাতড়ানো সিগারেটগুলোর একটা ধরাতেই ব্যস্ত।

ঘনাদা কি সত্যি ফাঁপরে পড়েছে নাকি ? অতক্ষণ ধরে সিগারেট ধরানো নিজের সেই বেসামাল অবস্থা ঢাকবার একটা ফিকির। কিন্তু এ ফিকির আর কতক্ষণ চালাবেন ?

চালাতে পারলেনও না। সিগারেট ধরানো শেষ করে শিশিরের নতুন লাইটারটা নিজের মুঠোতেই রেখে দিয়ে ঘনাদা প্রশ্নটা যেন ঠিক শোনেননি এমন ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ, কি যেন জানতে চাইছিলে ?

ঘনাদাকে বেকায়দায় পেয়ে আমরা সবাই যেন ঘোড়ার মুখে লাগাম দিয়ে তৈরী। শিশিরের বদলে শিবুই সবিস্তারে আমাদের প্রশ্নটা ঘনাদাকে শোনালে। তার সঙ্গে আমিই এবার শেষ তালটা ঠুকে দিয়ে বললাম—যা শুনলেন তার জবাবটা কোথাও আছে মহাভারতে ?

আছে !—ঘনাদার বেশ জলদগম্ভীর স্বর।

এটা ফাঁকা আওয়াজ না, সত্যিকার একটা পাকা চালের পাঁয়তারা পরখ করবার জন্যে যা বলব ভাবছিলাম তা আর বলবার দরকার হল না।

ঘনাদা নিজে থেকেই বললেন,—অভিমন্যু বধটা পড়েছ ? ভালো করে পড়ে দেখো।

অভিমন্যু বধ পড়ব ? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তারিখ জানতে ?

আমাদের সকলের সব ক'টা চোখই তখন বুঝি কপালে। কিন্তু ধাঁধাটা যাঁর সরল করবার দায়, তিনি ত হঠাৎ আরামকেদারা ছেড়ে উঠে এঘর ছেড়েই চলে যাচ্ছেন। শিশিরের লাইটারটা অবশ্য ফেরাতে ভুলে গিয়ে।

যেতে যেতে একটু দয়া তিনি শুধু করলেন। বারান্দার দরজা

দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে ক'টা কথা আমাদের দিকে যেন ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন।

কথাগুলো হল—ভালো করে পড়ো। তা পড়লে যা কিছু আসল সেইসব ওখানেই পাবে।

জয়দ্রথ বধে ঘনাদা

(২)

আমরা ঘনাদাকে বেকায়দায় ফেলে জব্দ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনিই আমাদের 'থ' বানিয়ে গেলেন।

তিনি ঘর থেকে হাওয়া, কিন্তু আমাদের বুদ্ধি-সুদ্ধিও সেই সঙ্গে যেন জট পাকানো।

অভিমন্যু বধ পালা পড়ো, খেই পাবে—তিনি বলে দিয়ে গেলেন। এটা কি ভাঁওতা ? কিন্তু রাম-ভাঁওতা হলেও আমাদের তা হেসে উড়িয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে থাকলে চলবে না। ভাঁওতাটা ধরিয়ে দেবার জন্যেই অভিমন্যু বধের পর্বটা কাশীরাম দাসে অন্ততঃ পড়তে হবে।

অন্য উপায় যখন নেই তখন আনাও কাশীরাম দাস। পড়ো অভিমন্যু বধের গোটা পালাটা।

চারজনে পালা করে তাই পড়লাম। সেই—

"যুধিষ্ঠির বলে বাপু শুনহ বচন।
ব্যূহ ভেদিবারে তুমি জান প্রকরণ ॥
অভিমন্যু বলে তবে শুন নরমণি।
প্রবেশ জানি যে আমি নির্গম না জানি ॥"

থেকে দ্রোণের সেই অতি দুঃখের স্বীকারোক্তি—

"ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যু জিনিতে যে পারে।
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে ॥
কৃষ্ণের সে ভাগিনেয়, অর্জুনের সুত।
দেখিলে সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত ॥
তাহারে নারিব ন্যায়যুদ্ধে কদাচন।
কহিনু জানিও মম স্বরূপ বচন ॥"

তারপর দুর্যোধনের কথায় সেই সপ্তরথীর একসঙ্গে অভিমন্যুকে আক্রমণ—

"বেড়িল বালকে গিয়ে সপ্ত মহারথী।
হানাহানি মারামারি যুদ্ধ চলে অতি ॥"

আর এসব বিবরণের শেষে সেই—

"সম্মুখ সমরে বীর ছাড়িল জীবন।
গমন করিল চন্দ্রলোকে সেইক্ষণ ॥"

শেষ পর্যন্ত কিছুই পড়তে বাদ রাখলাম না। কিন্তু আমরা যা চেয়েছি কোথায় সেই জবাব ?

সেদিন বিকেলেই তাঁর বিকেলের সরোবর-সভায় যাবার মুখে ন্যাড়া সিঁড়ির নীচেই তাঁকে ধরলাম।

কই ? শুধু অভিমন্যু বধের বৃত্তান্ত নয়, গোটা দ্রোণপর্বই ত পড়ে ফেললাম। কোথাও কিছু পেলাম না।

ঘনাদা কি আমাদের এমন দল বেঁধে চড়াও হওয়াতে ভড়কালেন ? বিন্দুমাত্র না।

বরং আমাদের আনাড়ীপনায় যেন হতাশ হয়ে করুণা করে বললেন—তার মানে সব পড়েও আসল খেইটা ধরতে পারো নি।

আসল খেইটা কোথায় ?—আমাদের গলায় অবিশ্বাসের সুরটা বেশ স্পষ্ট।

কোথায় ?—ঘনাদা যেন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে বললেন—জয়দ্রথ

কে, তা জানো ?

জানব না কেন ! খুব জানি ।—আমাদের আস্ফালন ।

তাহলে ওই জয়দ্রথের ব্যাপারটাই ভালো করে আর একবার পড়ো ।—বলে ঘনাদা হন্‌হন্‌ করে আমাদের ছেড়ে বারান্দা হয়ে নীচে নেমে গেলেন ।

আমরা রাগব না হাসব বুঝতে না পেরে তখন সবাই হতভম্ব ।

জয়দ্রথের ব্যাপারটা ভালো করে জানলেই আমাদের প্রশ্নের জবাব পাব ? কি পেয়েছেন আমাদের ঘনাদা ? আর কত এমন গুল ঝাড়বেন । নিজের গুল নিজেই শেষে সামলাবেন কি করে ?

তবু জয়দ্রথের ব্যাপারটা পুরোপুরি আর একবার না পড়ে আমাদের উপায় নেই । তাই পড়লাম । অভিমন্যু বধে যুধিষ্ঠিরের সেই বিলাপ থেকে—

"যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন বিবরণ ।
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ ॥
ব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেন জন ।
অভিমন্যু প্রতি তবে কহি সে কারণ ॥
এতেক শুনিয়া পুত্র লাগিল কহিতে ।
নির্গম না জানি ব্যূহে, জানি প্রবেশিতে ॥
তথাপিহ পাঠাইনু না করি বিচার ।
প্রবেশিল ব্যূহে শিশু করি মহামার ॥
তার পিছু যাই সবে হেন করি মনে ।
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দনে ॥
জয়দ্রথে জিনিবারে নারে কোন জন ।
সে কারণে মরিলেক অর্জুন নন্দন ॥"

থেকে—

"জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর ।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির ॥

মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আমি যাহা বলি তাহা শুন সর্বজন ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর ॥”

এসব কিছু নিয়ে সেই শ্রীকৃষ্ণের মায়া কৌশলে জয়দ্রথ বধ পর্যন্ত আগাগোড়া সবই পড়লাম। কিন্তু তার মধ্যে আমরা যা চাই সে জবাব কোথায়?

সেই কথাই বলতে পরের দিন সকাল হতেই সবাই মিলে টঙের ঘরে গিয়ে হাজির। অবশ্য উপযুক্ত ভেট না নিয়ে নয়।

ঘনাদা তখন সযত্নে তাঁর গড়গড়ার কলকেতে টিকে সাজাচ্ছিলেন। বনোয়ারীর বয়ে আনা ট্রের দুটি বড় বড় প্লেটে হিঙের কচুরি আর অমৃতিগুলির সুগন্ধ আর চেহারা ত বটেই—বায়না দেওয়া ডবল সাইজগুলো দেখেও খুশিটা একেবারে গোপন করতে পারলেন না। টিকে সাজানো কলকেটা গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে তামাকটা ধরতে দিয়ে বেদীগোছের তাঁর লম্বা চওড়া নীচু চারপায়াটির যথাস্থানে এসে বসে বললেন—এত সকালে এই হাতীমার্কা মাল কোথায় পেলে হে?

তাঁর এই খুশির ওপরই বড় ঘা দেবার জন্যে তৈরী থেকে বললাম—আজ্ঞে, ওগুলো আমাদের গলির মোড়ের রাদুর দোকানেরই, তবে কাল প্রায় মাঝরাতে বায়না দেওয়া।

বায়না দেওয়া 'মাঝরাতে'—ঘনাদা তখন কচুরির প্লেট কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার সদ্ব্যবহার শুরু করেছেন। সেই অবস্থাতেই যতটুকু বিস্ময় প্রকাশ করা সম্ভব তাই করে বললেন—তা মাঝরাতে কেন?

আজ্ঞে, তখনই আমাদের পড়াটা শেষ হল কিনা—বড় গোলাটা ছাড়বার আগে আমরা একটু ছর্‌রা ছিটোলাম।

পড়া শেষ হল? কি পড়া?—ঘনাদাকে সত্যিই দু' চোয়ালের

বাঁধানো দাঁতের কাজ একটু থামাতে হল, তারপর পূর্ব কথাটা স্মরণ করে কতকটা অবহেলা ভরে বললেন—ও, তোমাদের যা পড়তে বলেছিলাম, সেই জয়দ্রথের কথা সব পড়লে ?

হ্যাঁ—আমরা কামানটা দাগলাম—পড়ে দেখে বুঝলাম আপনি নিজে জয়দ্রথের বৃত্তান্ত কিছুই পড়েন নি, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হয়েছিল তার কোনো হদিসই সেখানে নেই।

ঘনাদা তাঁর চোয়াল নাড়া থামিয়ে হঠাৎ কি একটু টান হয়ে বসলেন। বসা আশ্চর্য কিছু নয়, কারণ এরকম সোজাসুজি ঘা তাঁর ওপর আমরা কখনো দিই নি।

এরকম ঘা খেয়ে ঘনাদা যদি একটু চমক খেয়ে থাকেন, তা মাত্র দু' সেকেণ্ডের জন্যে। সে মুহূর্তটুকু পার হতেই আবার যথাপূর্ব চোয়াল নাড়তে নাড়তে চোখে একটু উপহাসের ঝিলিক ফুটিয়ে বললেন—নেই নাকি ? আচ্ছা নীচে গিয়ে বোস। আমি সেখানেই গিয়ে সব শুনছি।

প্রতিবাদ না করে নীচেই নেমে গেলাম বটে, কিন্তু মেজাজ তখন সকলেরই আমাদের খোস। ঘনাদার এই সময় নেওয়া মানে যে তাঁর এখন সসেমিরে অবস্থা তাতে আর সন্দেহ নেই। তা সময় তিনি যত পারেন নিন। শেষ মাত-এর চাল এখন আমাদেরই মুঠোয়। হাবুডুবু খেতে খেতে তিনি ধরবার মত কুটিও পাবেন কিনা সন্দেহ।

শেষ পর্যন্ত ঘনাদা এলেন, বাইরে বেরুবার মত সাজপোশাকে একেবারে তৈরী হয়ে। শেষে মৌরসী কেদারাটি দখল করে যথারীতি শিশিরের বাড়িয়ে ধরা টিনটি থেকে সিগারেট নিতে গিয়ে টিনটি হাতে রাখতেও ভুললেন না। তারপর সিগারেট ধরিয়ে যেন ধীরে সুস্থে বললেন—আচ্ছা, তোমরা কি পড়েছ শুনি একটু !

সবই পড়েছি।—আমরাও ভারিক্কি চালে বললাম—জয়দ্রথের সেই আদি বৃত্তান্ত, পাণ্ডবদের বনবাসের সময়ে তাদের আস্তানা লুট করতে গিয়ে পাণ্ডবদের হাতের মার খাওয়া, বিশেষ ভীমের থাপ্পড়ে

পুরো দু'পাটি দাঁত উপড়ে যাবার পর তার সেই বারো বছরের দারুণ তপস্যা আর শেষে বাধ্য হয়ে শিবঠাকুরের সেই বর দিতে চাওয়া—

"শিব বলে বর চাহ সিন্ধুর তনয়।
এত শুনি জয়দ্রথ হরে প্রণময় ॥
অনেক করিয়া স্তুতি বলয়ে বচন।
অবধান কর প্রভু মম নিবেদন ॥
এই বর দেহ শূলপাণি।
পাণ্ডবগণেরে যেন রণে আমি জিনি ॥"

তাতে শিব যা বললেন, সেই—

"শুন তবে সত্য কথা সিন্ধুর তনয়।
জিনিবে পাণ্ডবগণে বিনা ধনঞ্জয় ॥"

এইসব শেষ করে অভিমন্যু বধ আর তারপর জয়দ্রথই অভিমন্যুর সহায়হীন ভাবে যুদ্ধে হত হওয়ার প্রধান কারণ জেনে—

"জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির ॥"

আর তারপরে অর্জুনের সেই প্রতিজ্ঞা—

"মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আমি যাহা বলি তাহা শুন সর্বজন।
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর।"

তারপর....

দাঁড়াও দাঁড়াও!—ঘনাদাই হঠাৎ গম্ভীর গলায় বাধা দিয়ে আমাদের থামালেন—এর পর আসল বিবরণটা ওখানে নেই।

ওখানে নেই মানে!—আমরা তাজ্জব—কোথায় আছে তাহলে? ব্যাসের মূল মহাভারতে?

না—ঘনাদা যেন দুঃখের সঙ্গে বললেন—সেখানেও ব্যাসদেব অর্জুনের খাতিরে একটু অদল-বদল করে বলেছেন।

অদল-বদল !—আমরা একটু সন্দিগ্ধভাবে বললাম—কি রকম অদল-বদল ?

না, সেরকম কিছু নয় ।—ঘনাদা আশ্বস্ত করলেন । এই একটু বাড়িয়ে কমিয়ে উল্টো-পাল্টা বসানো ।

আমরা এ নিয়ে কিছু তর্ক তোলবার আগে ঘনাদা নিজে থেকেই আবার বললেন—এই যেমন অর্জুন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করে—'এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর' বলার পর যা যা থাকবার কথা তা নেই । অর্জুনের মুখে তারপর যা বসানো হয়েছে, সে-সবও তার কথা নয় ।

তার মানে ?—এবার আমরা সত্যিই হতভম্ব ।

মানে, ওখানে যা থাকবার কথা তা হল—বলে ঘনাদা প্রায় সুর করেই আমাদের শোনালেন,—

"এত তীব্র পুত্রশোকে মূর্ছাহত প্রায় ।
অর্জুনের মুখে না আর বাক্য বাহিরায় ॥
তখন চিৎকারী উঠি দেবকীনন্দন ।
বলেন শুনহ সবে প্রতিজ্ঞা বচন ॥
কালি যদি জয়দ্রথ বিনাশ না হয় ।
সূর্যাস্তেই প্রাণ পার্থ ত্যজিবে নিশ্চয় ॥
দিনান্তেও জয়দ্রথ না মরিলে কালই ।
আত্মঘাতী হবে পার্থ নিজ চিতা জ্বালি ।"

অর্জুনের হয়ে শ্রীকৃষ্ণই এসব কথা বলেছিলেন ?—ঘনাদা তাঁর শোলোক পড়া থামাবার পর আমরা বেশ সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—মানে, এগুলো অর্জুনের তো মনের কথা নাও হতে পারে ? আর তা যদি না হয় তাহলে অর্জুনও একথা শুনে একটু চমকাবেন না কি ?

অর্জুন হয়ত বেশ একটু চমকেও গিয়েছিলেন ।—ঘনাদা তাঁর অনুমানটা বিস্তারিত করলেন, কিন্তু পুত্রশোকে তিনি তখন অধীর ।

শ্রীকৃষ্ণের কথা যত ভুলই হোক, তার প্রতিবাদের কোনো দরকারই আর তাঁর নেই।

সবই বুঝলাম।—শিশির যেন পুলিসী জেরার ধরনে জানতে চাইলে,—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ কাল সূর্যাস্ত পর্যন্ত জয়দ্রথ বধের সময় বেঁধে দিয়ে অর্জুনকে অমন রীতিমত বেকায়দায় ফেলতে গেলেন কেন ?

কেন তা তিনিই জানেন।—ঘনাদা ভক্তি গদগদ হলেন—তবে বিশ্বসংসার যিনি চালাচ্ছেন, চতুর চূড়ামণি সেই কৃষ্ণ বাসুদেবের নেহাত বাজে খামখেয়াল ওটা নিশ্চয় নয়। একটা কিছু মতলব তাঁর নিশ্চয় ছিল। দেখা যাক্ সে মতলব শেষ পর্যন্ত জানা যায় কিনা।

ভক্তি গদগদ হয়ে আগের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেও ঘনাদাকে পুরোপুরি হড়কে পালাতে দিলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলো মহাভারতে অর্জুনের জবানিতে চালান হল কি করে ?

সেটা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায়—ঘনাদা মহাভারতের বর্ণন-প্রমাদের রহস্য ভেদ করে বললেন—নিজের মহিমা তাঁর আর বাড়াবার দরকার নেই। তাই কীর্তির গৌরবটা অর্জুনকেই দিতে চাইলেন। মহামতি ব্যাসদেবও মানসবার্তায় তা টের পেয়ে সেই ইচ্ছাপূরণে ত্রুটি করেন নি।

আচ্ছা, অনেক কথাই জানলাম!—গৌর হঠাৎ ঘনাদাকে বেকায়দায় ফেলতে মূল মামলায় ফিরে গেল, কিন্তু এসব কথার মধ্যে আসল প্রশ্নের জবাব আছে কি ? সে জবাব কোথায় ?

ঘনাদা কি বেসামাল ? হঠাৎ কোনো ছুতোয় তিনি কি ঘর ছেড়ে যাবার তাল করবেন এবার ?

না। ভাঙলেও যিনি মচকান না, অমন সেই ঘনাদা অত সহজে দান ছাড়বার মানুষ নন।

বেশ ধীরে সুস্থে হাতের সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে তিনি

বললেন—আছে ! আছে। জবাব ঠিক যেখানে থাকবার সেখানেই আছে। এরপর আর কি পড়লে শুনি না।

এরপর ?— শিবু মুখে যেন সত্যিকার অরুচি ফুটিয়ে বললে— এরপর ত সেই মামুলী থোড় বড়ি খাড়া আর শ্রীকৃষ্ণের সেই সস্তা সস্তা ম্যাজিক দেখাবার ভড়কি !

ভড়কিটা কি রকম একটু শুনতে পাই না। ঘনাদার মুখে একটু বাঁকা হাসি লাগানো বলে সন্দেহ হল।

বেশ শুনুন তাহলে—শিবু তাল ঠোকার মত করে ওখানেই আনিয়ে রাখা ঢাউস কাশীরাম দাস-খানি কাছে টেনে পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে—পরের দিন অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের রথে জয়দ্রথকে খুঁজে কি রকম হয়রান—দ্রোণাচার্যের ব্যূহ-রচনার কায়দায় জয়দ্রথ বা কেমন নিশ্চিহ্নভাবে লুকালো—সে সব বিবরণ পড়বার নিশ্চয় দরকার নেই, আমি শুধু ভড়কির বর্ণনাটুকুই পড়ছি।

শিবু সেই বিরাট কাশীরাম দাস খুলে এবার পড়তে শুরু করল—

"জয়দ্রথে কোনো মতে পাওয়া নাহি যায়,
হতাশ হইয়া পার্থ সখাপানে চায়।
বলে, আর বৃথা কেন করি অন্বেষণ,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালো দিব প্রাণবিসর্জন।
পার্থের হতাশা দেখি দেব নারায়ণ,
সখারে সাহস দিয়া কহেন তখন।
কি ভয় আছে রে ইথে উপায় সৃজিব,
জয়দ্রথে আজিকেই নিধন করিব।
এত বলি সুউপায় চিন্তি নারায়ণ,
সুদর্শনে করিলেন সূর্য আচ্ছাদন।
আচম্বিতে দেখে সবে হইল রজনী,
কুরুসেনা মধ্যে হল জয় জয় ধ্বনি।"

ব্যস ? আর কি চাই ?

শিবু তার কাশীরাম পড়া থামাতেই ওপরের মন্তব্যটি শুনে আমরা চমকে বক্তার দিকে চাইলাম।

না, আমাদের শুনতে কোনো ভুল হয় নি। বক্তা স্বয়ং ঘনাদা ছাড়া আর কেউ নয়।

কিন্তু তিনি কি বললেন কি ? হঠাৎ বাতুল প্রলাপ বকতে শুরু করলেন নাকি ? প্রলাপ না হলে কথা ক'টার মানে কি ? ঘনাদাকেই সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

মানে !—ঘনাদা করুণার হাসি হেসে বললেন—মানে, যা চাও সবই ত পেলে !

সবই পেলাম !—আমরা হাসব না রাগে চেঁচাব বুঝতে পারছি না, তখন সেই অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করলাম—সব পেয়ে গেছি মানে আমাদের প্রশ্নের জবাবও পেয়ে গেছি বলতে চান ? কোথায় ?

কোথায় আবার ? ঘনাদা আমাদের মূঢ়তায় যেন বিস্মিত—এইমাত্র যা পড়লে ওই শোলোকগুলিতেই। তবে অবশ্য ঠিকমত পড়তে জানা চাই।

ঠিকমত আপনার পড়াটা কি শুনি ?—এবার আমাদের আর গরম হবার ভান করতে হল না। 'ওই সুদর্শনে করিলেন সূর্য আচ্ছাদন' পড়ে কি গভীর রহস্যের আপনি সন্ধান পেলেন বুঝতে চাই।

আরে !—ঘনাদা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন—রহস্য গভীর হবে কেন, একেবারে ওপরেই ভেসে রয়েছে। 'সুদর্শনে করিলেন সূর্য আচ্ছাদন' মানে কি সত্যি সত্যি সুদর্শন চক্রে সূর্য ঢেকে দেওয়া ? ওর আসল মানে, সেদিন ওই কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ইঙ্গিত দেওয়া। শ্রীকৃষ্ণ আর যেমন তেমন কেউ নন, আর সব কিছুর সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রটাও তাঁর পুরোপুরি জানা। তিনি আগেই কষে জানতে পেরেছিলেন কোন্‌দিন ওখানে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে। দিনটা ঠিক অর্জুনের জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞার পরের দিন হওয়ায় তিনি অমন করে অর্জুনের হয়ে কথা বলার ছলে অমন অসম্ভব

প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়েছিলেন সবাইকে। যতদূর বোঝা যায়, সেদিন বেশ মেঘলা ছিল, সেই মেঘের আড়ালে বেশ খানিকটা বেলা থাকতেই হঠাৎ গ্রহণ শুরু হয়ে একেবারে পূর্ণগ্রাসে পৌঁছোয়। দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামছে ভেবে জয়দ্রথকে নিয়ে কুরুযোদ্ধারা অর্জুনের অগ্নিকাণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ-বিসর্জন মজা করে দেখতে আসে। আর তখনই পূর্ণগ্রাসের পর সূর্যের রাহুমুক্তি আবার শুরু হয়, আর দিনের আলো থাকতেই জয়দ্রথকে সামনে পেয়ে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা পালনের কোনো অসুবিধা আর থাকে না!

এ বিস্তারিত ব্যাখ্যা শেষ করে ঘনাদা শিশিরের পুরো সিগারেটের টিনটি হাতিয়ে আরামকেদারা ছেড়ে ওঠবার উপক্রম করতে আমরা তাঁকে প্রায় জোর করে ধরে রেখে দাবী করেছি—কিন্তু আমাদের প্রশ্নের জবাব মহাভারতে কই?

এখনো সে কথা জিজ্ঞাসা করছ? আমাদের সম্বন্ধে তাঁর হতাশাটা ভালো করেই গলার স্বরে বুঝতে দিয়ে বললেন—আরে সূর্যগ্রহণ কারোর খামখেয়ালে হয় না। তা হয় একেবারে নির্ভুল অঙ্কের হিসেবে। এই ক'দিন আগে আমাদের এখানে সূর্যের পূর্ণগ্রাস হয়ে গেছে। সত্যিকার জ্যোতির্বিদ কাউকে ধরো, এই গ্রহণ থেকে পিছনে হিসাব চালিয়ে তারিখ, জয়দ্রথ-বধ মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পল-বিপল পর্যন্ত নির্ভুল বলে দেবে।

আমাদের চোখগুলো কপালে উঠিয়ে রেখেই ঘনাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এবার আর তাঁকে বাধা দিতে পারলাম না।

